Indagare

A Journal of Scholars
Available online at www.indgr.org

Mitigating Self-esteem Crisis: Road to Human Security and Corruption-free Bangladesh

DOI: 10.5281/zenodo.13175319

Citation: Ashraf ud Dowla, A. ud D. (2024). Mitigating Self-esteem Crisis: Road to Human Security and Corruption-free Bangladesh (1.0.0) [Indagare].

Author:

Ashraf –ud- Dowla

Article Received: 1 Sep 2024
Article Accepted: 2 Sep 2024
Published Online: 4 Sep 2024

Abstract:

Mitigating Self-esteem Crisis: Road to Human Security and Corruption-free Bangladesh

৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টাগণ দুর্নীতিরোধ এবং জননিরাপত্তার সুচক মজবুত করতে দিনরাত ছুটে চলেছেন রাষ্ট্রের সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে। রাষ্ট্র সংস্কারের মূল লক্ষ্যটি অর্জন করতে দুর্নীতি ও অনিয়মের মৌলিক কারণ উৎঘাটনের জন্য মিক্সড মেথড ডিজাইনে এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানকে কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করে এবং নানা তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান ভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে নিম্নমুখী সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিশেষ করে নাগরিকদের মাঝে আত্মসম্মানবোধের তীব্র ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল দেশের নীতিনির্ধারকসহ সকল পর্যায়ের নেতৃত্ব, শিক্ষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও নির্মাতা এবং অভিভাবকগনের মাঝে ‘আত্মসম্মানবোধ বনাম দুর্নীতি’ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে।

মূলশব্দঃ আত্মসম্মানবোধ; দুর্নীতি, জননিরাপত্তা, রাষ্ট্র সংস্কার।

Mitigating Self-esteem Crisis: Road to Human Security and Corruption-free Bangladesh

চেতনার সংকটে আত্মসম্মানবোধঃ জননিরাপত্তার পথে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ

গবেষক

আশরাফ -উদ-দৌলা

সারসংক্ষেপ

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামজিক পরিস্থিতি এক গভীর সংকটের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। বিগত দশকগুলোতে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে যে অসীম অনিয়ম ও লাগামহীন দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে জননিরাপত্তার প্রতিটি নিয়ামক (খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা,ব্যক্তির নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা, পরিবেশের নিরাপত্তা,সামাজিক নিরাপত্তা) মারাত্ত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। চারিদিকে অনিয়ম দেখে দেখে দুর্নীতি ঢুকে গেছে জাতির এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চেতনায়। অনেকেই ন্যায় অন্যায় বিবেচনার উদ্ধে রেখে শুধু অর্থ-সম্পদ অর্জন করাকেই সম্মান বলে বিশ্বাস করে চলেছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টাগণ দুর্নীতিরোধ এবং জননিরাপত্তার সুচক মজবুত করতে দিনরাত ছুটে চলেছেন রাষ্ট্রের সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে। কিন্তু এ যেন এক পাহাড়সম কর্ম কেননা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি পরিসরে গভীরভাবে বাসা বেঁধে আছে লাগামহীন দুর্নীতি। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র সংস্কারের মূল লক্ষ্যটি অর্জন করতে সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির মৌলিক কারণ উৎঘাটন এবং সেই মূল কারনের সমাধান করা সম্ভব না হলে শত চেষ্টায় যা কিছু সংস্কার করা হবে তার সবই পূর্বের সকল সংস্কারের মত পুনরায় মুছে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। জাতীয় জীবনের এমন ক্রান্তিকালে রাষ্ট্র সংস্কারের দীর্ঘমেয়াদী সুফল সংহত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনিয়মের মৌলিক কারণ উৎঘাটনের জন্য মিক্সড মেথড ডিজাইনে সীমিত পরিসরে এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানকে কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করে এবং নানা তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান ভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে নিম্নমুখী সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিশেষ করে আত্মসম্মানবোধের তীব্র ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। জাতিকে পুনর্গঠনে ও সংস্কারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে তাই পারিবারিক, সামাজিক, ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধকে উচ্চ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এই অধ্যয়নে। প্রাতিষ্ঠানিক ও গণশিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতির আত্মসম্মানবোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে ও আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য সকল প্রকার মিডিয়ার উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। আশা করা যায়, এই গবেষণার ফলাফল দেশের নীতিনির্ধারকসহ সকল পর্যায়ের নেতৃত্ব, শিক্ষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও নির্মাতা এবং অবিভাবকগনের মাঝে 'আত্মসম্মানবোধ বনাম দুর্নীতি' বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে।

মূলশব্দঃ আত্মসম্মানবোধ; দুর্নীতি, জননিরাপত্তা, রাষ্ট্র সংস্কার।

১.১ প্রারম্ভ

শত ব্যধিতে জর্জরিত মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষকে বাঁচানো যাবে কীভাবে? রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম আর দুর্নীতিতে ডুবে থাকা একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে উদ্ধার করার সব থেকে কার্যকরী কৌশলটি কী হতে পারে?

উপরে বর্ণিত দুইটি সমস্যা যদিও দুই রকম বলেই অনুমেয় তবে নিরাময়ের উপায় হিসেবে দুটি ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতি কাজ করে। মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রীকে বাঁচানোর জন্য দ্রুততার সাথে কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম আর দুর্নীতিতে আকন্ঠ নিমজ্জিত জাতিকে রক্ষা করতে নিশ্চিতভাবেই কিছু উপযুক্ত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার। তাৎক্ষণিক ঐসব ব্যবস্থা নেয়ার মধ্য দিয়ে মুমূর্ষু মানুষটিকে কিংবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হওয়া কোন রাষ্ট্রকে হয়ত আরও কয়েকটা দিন জীবিত রাখা যেতে পারে কিন্তু সেই তাৎক্ষণিক বা আশু ব্যবস্থা কোনভাবেই সমস্যাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী কোন সমাধান দিতে পারে না। হাজারো সমস্যায় আক্রান্ত কোন রাষ্ট্রকে একটি সার্বজনীন কল্যাণমুখী জাতিসত্ত্বায় পরিণত করতে হলে সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য আশু ব্যবস্থার সাথে সাথে কিছু মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থা এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে নির্ণীত উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মূলত রাষ্ট্রের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কিংবা মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার ফলাফলে যেটুকূ কল্যাণ পাওয়া সম্ভব তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। তাই সংকট সমাধানে আশু ব্যবস্থার সাথে সাথে সেসব সংকট সৃষ্টির মূল কারণসমুহে অধিকতর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। একটি অসুস্থ্য দেহকে সুস্থ্য করার জন্য যেমন শুধু শরীরের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা জীবানুকে খুঁজে বের করে তা মেরে ফেলাই যথেষ্ট নয় বরং সেসব জীবাণুর উৎসকে খুঁজে নিয়ে সেই উৎসকেই সমুলে বিনাস করা প্রয়োজন তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রবণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনিয়মের মৌলিক কারণগুলো খুঁজে নিয়ে সেখানেই ইনভেস্ট করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির গভীরে যেতে একটি সমসাময়িক উদাহরণ হিসেবে একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলাদেশকেই আলোচনার মূল প্রেক্ষাপট হিসেবে উপস্থাপন করা সঙ্গত হতে পারে।

সবুজ শ্যমল বাংলাদশের ভুখন্ডে বয়ে চলছে শত শত নদ-নদী। উর্বর জমিতে সহজেই ফসল ফলে, খালে-বিলে-নদীতে ভরে থাকে নানা জাতের মাছ,খামারে নানা প্রকার গবাদি পশু,আরামদায়ক আবহাওয়া,সহজ সরল আর বন্ধুবৎসল প্রতিবেশী; জগতের মাঝে বাংলা ভূমি ছিল যেন এক টুকরো স্বর্গ। তাইতো হাজার বছর ধরে পৃথিবীর

নানা প্রান্তের নানা বর্ণ, ধর্ম ও গোত্রের মানুষেরা সুখ ও প্রশান্তির অন্বেষণে এই ভূখণ্ডে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এ জাতির শারীরিক গঠন ও চেহারায়। প্রচুর সম্পদশালী হওয়ায় জগতের মানুষের কাছে এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত কাংক্ষিত;কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ সেই চিত্র ভয়ঙ্করভাবে আলাদা। গোল্ড ও ডায়মন্ডের খনি যেমন আফ্রিকার মরুতে রক্তবন্যার কারণ হয়েছে তেমনি সহজ সরল মানুষের এই সবুজ মানচিত্র রাক্ষসের আক্রমনে বার বার ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, পরাধীন থেকেছে শত শত বছর ধরে। তবে নানা চরাই উতরাই পেরিয়ে দুইশত বছর সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একবার স্বাধীন হয়েছিল। বিদেশিদের কব্জা থেকে স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু জনগণের অধিকার এদেশে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বছরের পর বছর অপশাসন, নিষ্পেষণ, অবিচার আর দুর্নীতির বিস্তার হয়েছে দেশের বড় বড় দলের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। বছর দশেক আগে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের শাসন আমলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষক ও অতি নিকটজন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সে সময়ের বাংলাদেশে দুর্নীতির অব্যাহত চক্রবৃদ্ধি দেখে গভীর দুঃখ ভরে বলেছিলেন, 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নৈতিক স্বপ্ন অর্জিত হয় নাই'।

বস্তুত লাগামহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, ও দুঃশাসনে কয়েক দশক ধরে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল ভয়ঙ্করভাবে ভয়ার্ত। শুধুমাত্র জননিরাপত্তার মৌলিক প্রয়োজনে বিগত কয়েক দশক ধরে এদেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। এদেশের মেধাবী জনগোষ্ঠী ও ছাত্রদের একটি বড় অংশ আর এদেশে নেই; তারা এখন ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দেশগুলোর উন্নয়নে তাদের মেধা বিকাশ করছে। যারা এখনও সেসব দেশে চলে যেতে পারেন নাই তারাও আপ্রাণ চেষ্টা করছে দেশ ত্যাগ করতে। তা বলে, ঐসব মেধাবী মানুষদের মাঝে দেশপ্রেম কিংবা মাতৃভুমির প্রতি ভালোবাসা যে কম তা কিন্তু নয়, বরং জীবন যেখানে হায়েনার মুখে, বেঁচে থাকা যেখানে অনিশ্চিত, যেখানে ন্যায়বিচার,অধিকার,ও স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নাই সেখানে দেশপ্রেম শব্দটি কতক্ষন জীবিত থাকতে পারে? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এক সময়ের শান্তির ভূমি বাংলাদেশ কেন এমন নিরাপত্তাহীন ভয়ার্ত পরিবেশে পরিণত হয়েছিল; কিসের অভিশাপে এদেশের নিরীহ জনগণকে বার বার নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার হতে হয়েছিল? এ জাতির সব সংকটের মূল সংকটটি কোথায় যার সমাধান করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রের অধিকাংশ সমস্যাগুলো মিটে যেতে পারে? বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই অধ্যয়নে সীমিত পরিসরে একটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সেই প্রশ্নটিরই সামাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ পটভূমি

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের এই ভুখন্ডে সাধারণ জনগণ অতীতে ঠিক কবে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার পেয়েছিল তা বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ মানুষেরা কখনও সেন বংশ, কখনও পাল বংশ, কখনও নবাব, কখনও ব্রিটিশ, কখনও পাকিস্থানি এইভাবে নানা শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুক্ত রয়েছে অনেক বেদনা,অনেক সংগ্রাম, বিদ্রোহ আর আত্মত্যাগের গল্প। ফকির বিদ্রোহ, সন্যাস বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নব্বই এর গণ-অভ্যুত্থান যেমন এ জাতির গৌরবের ইতিহাস বহন করে চলেছে তেমনি বাঙ্গালি জাতির জাতিসত্ত্বার সাথে কালিমাও রয়েছে অনেক। এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরীহ শান্তি প্রিয় হলেও এই জাতিরই পেশিশক্তিওয়ালা ধনী সম্প্রদায় সবসময়ই গরীবদের নিষ্পেষিত করেছে। রাজা, মহারাজা আর জমিদার সেজে ব্রিটিশদের স্বার্থ রক্ষায় পালা লেঠেলদের ব্যবহার করে নিজ দেশের মানুষকেই তারা যে অসীম নির্যাতন ও নিপীড়ন করত তার উদাহরণ আজও কিছু কিছু জীবিত। অধিকাংশ ধনী শ্রেণির মানুষদের অত্যাচার ও অনৈতিক আচরণে দেশের নিরীহ জনগণ যে নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে অধ্যপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, ‘ এ দেশের মানুষের নৈতিকতার খুব একটা সুনাম কোন কালেই ছিল না। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের জীবনীতে, ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে, ব্রিটিশ লেখক ও তাদের অফিসারদের বর্ণনায়, এমনকি আধুনিক বাংলাদেশের দৈনিন্দন জীবনে অনৈতিক আচরণের হাজারো চিত্র এখন অহরহ পাওয়া যায়’(দৈনিক প্রথম আলো ৪ আগস্ট ২০২৪)।

১৯৭১ পূর্ববর্তি সময়কে পরাধীনতার কাল মনে করা হলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়কে বাংলার মানুষের মুক্তির অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এতোটাই কলুসিত হয়ে উঠেছিল যে গণমানুষের মৌলিক অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। ভিন্ন মতের মানুষদের জীবন,সম্ভ্রম,সম্পদ কোনকিছুর নিরাপত্তা ছিল না এখানে। বিগত ৫০ বছরে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম ব্যবহার করে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা নিজেদের চাঁদাবাজ, লুটতরাজকারী ও দুর্বৃত্ত হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিল। অনন্যপায় জনগণ সেইসব দুর্বৃত্তদের মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত কম মাপের দুর্বৃত্ত খুঁজতে মরিয়া হয়ে ১৯৯৬,২০০১ এবং ২০০৯ সালের নির্বাচনে সরকার বদল করেছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দল পরপর দুইবার জয়লাভ করতে পারবে না। তাই কুটকৌশলে তারা সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয় এবং প্রায় ১৫ বছর ধরে লাগামহীন লুটের রাজ্য কায়েম রেখেছিল। বিশেষ করে বিগত এক দশক ধরে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার অপরাধে জ্ঞানীজনেরা বারংবার অপমানিত হয়েছেন; প্রজ্ঞাবান মানুষেরা জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন;দেশপ্রেমিক মানুষদের অনেকেই খুন-গুমের শিকার হয়েছেন; বাকস্বাধীনতা বলে তেমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এখানে মুলা চোরের ফাঁসি দিয়ে মিডিয়াকে উত্তপ্ত রেখে গণমানুষের চেতনাকে হাইজ্যাক করা হয়েছিল। মানুষের মনোযোগ ভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত রেখে রাজক্ষমতার মালিক ও তাদের সহযোগীরা নির্বিঘ্নে হাজার হাজার

কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। দুই একটি পরিবার ও তাদের দোসররা মানুষরুপী পিশাচে পরিণত হয়ে গোটা জাতিকে মুখে পুড়ে গিলে ফেলার সব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিল।

একদিকে দেশের সাধারণ মানুষেরা প্রতিনিয়ত অভাব, অসম্মান, দুর্ভোগ,ও নিপীড়নে আক্রান্ত অন্যদিকে রাজদরবারের লেঠেল,রাজকর্মকর্তা, রাজকর্মচারী ও রাজপুত্রদের দাপটে বিস্তর লুটপাট হয়েছে এদেশের সম্পদ। কুশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের সমৃদ্ধ সোশ্যাল ক্যাপিটালগুলো অনেকটাই ধ্বংস করা হয়ে গেছে বিগত কয়েক দশকে। মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকারীরা প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিয়ে সেসব অর্থের বড় অংশ বিদেশে পাচার করে দিয়ে দেশটির অর্থব্যবস্থাকে একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছে। বিলিয়ন ডলার পাচার করা হল অথচ জাতির বিবেক ও অভিভাবক হিসেবে পরিচিত দেশের সর্বোচ্চ বিচারকের কার্যালয় থেকে আদেশ দিয়ে সেই অর্থ পাচারের তদন্তকে বন্ধ রাখা হল (২৩ আগস্ট ২০২৩, দৈনিক ভোরের পাতা)। ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, পালোয়ান, নায়িকা আর গায়িকাগণ দেশের আইন প্রনেতা হয়ে জাতীয় সংসদকে যেন একটা থিয়েটার আর সার্কাসের মঞ্চে পরিণত করলেন। এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হরতাল-মারামারি- খুন-গুম এসবই ছিল বিগত তিন দশকের নিত্য বাস্তবতা। সর্বত্র যেন ক্ষমতার লড়াই আর সম্পদ লুটের কাড়াকাড়ি; ক্ষমতার চেয়ার নিয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা যে শুধু রাজনীতিতেই দেখা যেত তা নয় বরং প্রতিটি সরকারী অফিস, আদালত, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক জগত,মিডিয়া,বাজার কমিটি এমনকি মসজিদ ও মন্দিরের কমিটিতেও তা স্পষ্ট ছিল।

প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল উৎস কোথায়, জনগণ নাকি দলের নেতা-কর্মী? যে নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে দল গঠিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক দর্শনের মূল মোটিভেশন কি? নানা দলের ঐসব নেতা-কর্মীদের মোটিভেশনে সত্যিই কি কোন জনকল্যাণমূলক মৌলিক মূল্যবোধ আছে, নাকি যেকোন ভাবেই হোক লুটপাট করে ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন করাই তাদের মূল লক্ষ্য?

বিগত দশক ধরে এখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা নানা অজুহাতে যখন যেভাবে ইচ্ছে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনগণকে জিম্মি করে গরীব মানুষের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিয়ে গেছে। এদেশে ধনীরা প্রতি ঘণ্টায় আরও ধনী হয়েছে আর গরিবেরা দিনে দিনে আরও নিঃস্ব হয়েছে। হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসা সেবার মান অত্যন্ত নাজুক তাই প্রতি বছর হাজার কোটি টাকা চলে যায় পাশের দেশের হাসপাতালগুলোকে। উপযুক্ত গবেষণা ও প্রজ্ঞার বাস্তবসম্মত ব্যবহার ব্যতিতই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বারংবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরো পদ্ধতিকেই পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আর জ্ঞানপাপীদের মাধ্যমে বিস্তর ভুলসহ শিশুদের পাঠ্য বই ছাপিয়ে দেয়া হল আর নানা কৌশলে অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হল যুবক ও কিশোরদের মাঝে। গণমানুষের চেতনা নিয়ে ইঞ্জিয়ারিং

করার জন্য টিভি, ইন্টারনেটসহ সবরকমের প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়াতে লজ্জাজনক আচরণের প্রোপাগেশন করা হল। গণমাধ্যমকে এমনভাবে সাজানো হল যেন হাজার বছরে লালিত বাঙালি জাতির উদারতা, সহিষ্ণুতা আর মানবিকতার মূল্যবোধ বদলে এই জাতিকে আত্মকেন্দ্রিক, অসহিষ্ণু ও ভোগী লোভী করে দেয়া যায়। গত পাঁচ দশকে এদেশে নানা পদ্ধতিতে যারাই এল ক্ষমতায় তারাই হয়ে গেল হিরকের রাজা। বিদেশি শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে সেসব নেতা ও তাদের সাঙ্গপাংগ মিলে জনগণকে নানা প্রকার খেলা,নেশা,জুয়া,ও দলবাজিতে মত্ত রেখে জাতির জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার সবরকম আয়োজন পাকা করে এনেছিল। জাতিকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কতটা সফল হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সদ্য স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশের আগস্ট ২০২৪ মাসের মাত্র কয়েক দিনের কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরা হল।

২০ আগস্ট ২০২৪, দেশের অনেকগুলো জেলায় মানুষ যখন বন্যার পানিতে ডুবে দুর্যোগে দিশেহারা, প্রায় এক কোটি মানুষ বেকার, সর্বগ্রাসি লুন্ঠনে রাষ্ট্রযন্ত্র যখন প্রায় ভেগে পড়েছে, বিদেশী গোয়েন্দাবাহিনীর সদস্যরা রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিষাক্ত ফনা তুলে ছোবল দেয়ার জন্য প্রতিটি সুযোগের অপেক্ষায়, দেশের অভ্যন্তরে বিরামহীন ষড়যন্ত্র, ডলারের উচ্চমূল্য, রপ্তানি বানিজ্যে চরম মন্দা - এমন কঠিন পরিস্থিতির মাঝে জাতির বিবেক নামে পরিচিত এক শ্রেণির চাকুরীজীবীগণ নিজেদের অধিকার- পদন্নোতি- সুযোগ -সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় নামলেন আন্দোলন করতে। বিগত ১৫ বছরে তারা সেই সময়ের দুর্বৃত্ত সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্ত প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা নাই অথচ জাতির এই ক্রান্তিকালে যখন কয়েকজন প্রবীণ মানুষ পাহাড়সম সমস্যা সংকুল বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব মাত্র দায়িত্ব নিয়েছেন তার কয়েক দিনের মাঝেই আন্দোলন শুরু হল। হাসপাতালের বিছানায় অসংখ্য গুলিবিদ্ধ মানুষ, শহীদদের রক্তের দাগ শুকায় নাই, দেশের অর্থব্যবস্থা প্রায় ভংগুর,এমন সময়ে সেই চাকুরীজীবীগণ শিশু-কিশোরদের লাশ দিয়ে অর্জিত মুক্তমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। নৈতিকতা আর জাতীয় মূল্যবোধ ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা গভীর ভাবনার বিষয়।

২১ আগস্ট ২০২৪, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে হাজির করার সময় সদ্য ক্ষমতা হারানো একজন মন্ত্রিকে আদালত চত্তরেই কিল-ঘুসি আর চড়-থাপ্পর মেরে নিজেদের নাম ও শক্তি প্রদর্শন করলেন আইনজীবীগনের বড় একটি দল। অথচ আজ যারা এক সময়ের ঐসব রাঘব-বোয়ালদের চড়-থাপ্পড় দিয়ে শান্তি অনুভব করছেন তাদের অধিকাংশই মাত্র কিছুদিন পূর্বে ঐসব মন্ত্রিদের একটু সূনজর পাওয়ার জন্য নিজেদের মাঝেই তীব্র প্রতিযোগিতা করতেন। ছোটবেলা থেকেই গুনেছিলাম, আইনজীবীগণ আইনের সর্বোচ্চ রক্ষক এবং তারা সত্যের প্রতি অন্ধ কিন্তু তাদেরকেই দেখা গেল বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অসম্মান করে আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে। শুনেছি ঐসব

আইনজীবীগণ নাকি কোন একটা রাজনৈতিক দলের অনুসারী কিন্তু আমরা বুঝতে অক্ষম যে সত্যের রক্ষক আইনজীবীগণ কীভাবে কোন রাজনৈতিক দল কিংবা অন্য কারো জন্য পক্ষপাতী হতে পারে। এমন অদ্ভুত মূল্যবোধ সম্পন্ন আইনজীবীদের সংখ্যা এদেশে এখন কত শতাংশ ?

২৩ আগস্ট ২০২৪, কয়েকজন সাংবাদিক স্বদেশ ত্যাগ করার সময় তারা বিমান বন্দরে আটক হলেন;তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তারা অপসাংবাদিকতা করেছেন। এই যে অপসাংবাদিকতা শব্দটি উচ্চারণ করা হল, বিগত দশকগুলোতে এই শব্দটির সাথে যুক্ত ছিলেন এদেশের কত শতাংশ সাংবাদিক ও মিডিয়া হাউজ? হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে যা এদেশের একজন সাধারণ ভিক্ষুকও বিশ্বাস করতেন অথচ এদেশের অধিকাংশ সাংবাদিকগণ ঐসব অর্থ পাচারকারিদের পেছনে নয় বরং মুলা চোরের সন্ধানেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। দুই-একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তার দুর্নীতির খবর কয়েকজন বীর সাংবাদিক জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন কিন্তু সেই দুর্নীতির গল্পটুকু যে সাগরে ভেসে থাকা হীমশৈলের অতি ক্ষুদ্র অগ্রভাগ তা সকলেই জানতেন। আজ যারা এদেশে নেতা, কর্মী, ছাত্র, সরকারী অফিসার, ও ব্যবসায়ীদের অনেকেই ধনী মানুষ হয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন তাদের সম্পদের উৎস কি তার সংবাদ যে খুব একটা প্রকাশ হচ্ছে তা বলা অন্যায়। বরং কীভাবে নিজের সম্পদ আরও বাড়ানো যায়, কীভাবে আরও সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে নেয়া যায়, কীভাবে প্রধান মন্ত্রীর সফর সঙ্গী হওয়া যায় তারই সন্ধানে সাংবাদিকগনের একটি বড় অংশ ন্যায় অন্যায় ভুলে সরকারকে তোষামোদি করতেই ছুটে বেড়িয়েছেন সে দিনগুলোতে। বিগত ৩০ বছরে মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তি ব্যতিত সাংবাদিকতার নামে যা হয়েছে তা জনগণের রক্ত ও মাংস দিয়ে রাক্ষসকে খুশী করার প্রয়াস বলেই অনুমান করা যায়।

২৫ আগস্ট ২০২৪; নানাবিধ দাবী নিয়ে কয়েক হাজার আনসার সদস্য বাংলাদেশের সচিবালয় ঘীরে রাখলেন,গুলি চালালেন, সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন শিক্ষার্থীদের সাথে। এইসব আনসার সদস্যদের দাবীগুলো যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক তা আলোচনা করা যেতে পারে তবে দেশের এই ক্রান্তিকালে তাদের ঐ সব দাবী নিয়ে সচিবালয় ঘীরে রাখা, উপদেষ্টাগণকে কাজ করতে না দেয়া নিশ্চিতভাবেই অযৌক্তিক। এই দিনে ঢাকার রায়ের বাজার থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম পুলিশ সদস্যদের মাঝে কেমন দুঃখ, কষ্ট আর তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে তার অনুভূতি। তারা বেশ কয়েকদিন পর থানায় এসেছেন কিন্তু কোন কাজ করতে কিছুমাত্র ইচ্ছে অনুভব করছেন না। এর মূল কারণ এই যে তারা জেনেছেন যে তাদের সকল সদস্যকে ঢাকা ছেড়ে দেশের অন্যত্র স্থানে বদলি করা হবে। বুঝতে পারছিলাম, বহু কষ্ট, চেষ্টা, তদবির কিংবা আরও অনেক কাঠখর পুড়িয়ে যারা রাজধানীতে একটি পোস্টিং জোগাড় করেছিলেন তাদের সেই ইনভেস্টমেন্ট নিয়েই গভীরভাবে অস্থির। কাজ না করার ওজুহাত হিসেবে তিনি পরিস্কারভাবে বললেন, পুলিশের কাজ কেবল কোর্টের আদেশ পালন করা। বললাম,জনজীবনের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাত্যহিক খুটিনাটি সব কিছুতেই তো আর কোর্টের আদেশ হয় না, আবার

সব ক্ষেত্রে কোর্টের আদেশ যে দ্রুত পাওয়া যায় তাও নয় – যদি এরই মাঝে কোন একটা অঞ্চলে মারামারি কিংবা বিশৃঙ্খলা বেঁধে যায় সে বিষয়ের উপর কাজ করার জন্য আপনাদের কি দায়িত্ব? তিনি বললেন, ওটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। প্রশ্ন জাগে, আইন রক্ষাকারী বাহিনীর অফিসারদের দায়িত্ববোধের অনুভূতি, নিজ কাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের চেতনা এদেশে ঠিক কি মূল্যবোধ দিয়ে নির্মিত হয়েছে?

দেশের সার্বিক জননিরাপত্তার পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করে ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোতে স্যার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছিলেন, ‘আজ এ দেশে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা প্রতি মুহূর্তে দুর্নীতি আর নিগ্রহে নিষ্পেষিত হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল হারিয়ে অসহায়। যারা লুণ্ঠনকারী তারাও অন্য লুণ্ঠনকারীদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে’। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পর কয়েকদিন দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে দেশব্যাপী ডাকাতি ও লুটতরাজ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় সাধারণ মানুষেরা নিজ নিজ এলাকায় দল বেঁধে সারারাত পাহারা বসিয়েও নিস্তার পাই নাই। চারপাশের ঐসব লুটতরাজের দৃশ্য থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে শুধু রাজনৈতিক অংগনে নয় বরং সবক্ষেত্রেই নৈতিকতার মান এদেশে অত্যন্ত নিম্নমুখী। আমরা শিক্ষার্থী- এই নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির খবর শুনতে পাওয়া গেছে। ১৪ আগস্টে বাংলাদেশ প্রতিদিন নামক দৈনিকের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কাওসার নামে এক যুবক নিজেকে শিক্ষার্থী পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা চাঁদা তুলেছিল। আরও নানা স্থানে এইরুপ অপকর্ম হওয়া এদেশে যে একেবারেই বিচিত্র নয় তা স্পষ্ট। দখল আর চাঁদাবাজিই যেন রাজনীতির প্রধান কাজ তাই বিগত সরকারের মদদ পুস্ট লোকজন যখন পালিয়েছে তখন নতুন নতুন মাস্তান নানা দলের নাম, পদ ও পরিচয় দিয়ে ঘাট দখল, বাজার দখল,জমি দখল ইত্যাদি শুরু করেছে।

মহাসড়কগুলোতে অসংখ্য মানুষের জীবন হাতে নিয়ে বাস ও ট্রাক চালকেরা যেভাবে বেপরোয়া মানসিকতা নিয়ে গাড়ি চালায় তা এক কথায় চরমভাবে দায়িত্ববোধহীন আচরণ। বাজারে ফল, সবজি, মাছ ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের সাথে বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে; জীবন রক্ষাকারী ঔষধে ভেজাল, বাটপারের ক্ষপ্পরে পড়ে সব হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে এক যুগ ধরে মরুভুমিতে কাজ করে ঘরে ফেরা শ্রমিক। বন্যা কবলিত মানুষদের উদ্ধার ও তাদের কাছে ত্রান পৌঁছে দেয়ার মত অত্যন্ত পবিত্র কাজের মাঝেও বেশ কিছু মানুষকে দেখা গেল ত্রান কাজকে উপলক্ষ্য আর আত্মপ্রচারকে লক্ষ্য বানিয়ে নানা ছবি ও ভিডিও প্রচার করতে। কাউকে দেখা গেছে শুধু নিজের পোষ্টটিকে ভাইরাল করার লক্ষ্যে নানা প্রকার কৃত্তিম ছবি ও ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিতে। মাত্র তিন দশক আগেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ কোন মহৎ কাজে যুক্ত হলে সেই কাজ দিয়ে নিজেকে প্রচার করতে অনেকটা লজ্জা অনুভব করতেন কিন্তু এখন সে চিত্র ভিন্ন। মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব সেবা কিংবা যে কোন উপলক্ষ্যে আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা যেন বেশ গতি নিয়ে উড়ছে এদেশের বর্তমান সামাজিক পরিমণ্ডলে।

১৫ আগস্ট ২০২৪; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি থানায় কয়েকজন তরুণী এসে থানা হেফাজতে থাকা একজন যুবককে ১০ মিনিটের জন্য নিজেদের অধিকারে নিতে চাইল। এই তরুণীরা জনসম্মুখে যে দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তা কতটা সম্মানজনক আচরণ তা বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়েছে। এমন ঘটনা যে মাত্র একটি দুইটি বিচ্ছিন্ন বিষয় তা নয় বরং সারাদেশেই নানা লেভেলে এইরুপ আচরণের বিস্তার হয়েছে এবং দেশের বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এইরুপ আচরণকে সাহসী আচরণ বলে আখ্যা দিচ্ছেন। বস্তুত কয়েক দশক আগে যাকিছু ছিল সামাজিকভাবে লজ্জাজনক আচরণ সেসবের অনেকগুলোই বদলে গিয়ে এখন উল্লাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। তিন দশক আগে একজন জ্ঞানী মানুষ এদেশে যেটুকু সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছেন এখন আর তেমন নাই। বদলে গেছে মানুষের চেতনা, বদলে গেছে মর্যাদার তাৎপর্য; তাই লম্পট হলেও যার টাকা আছে তিনিই বসেন সম্মানের উচ্চাসনে; কিন্তু কেন এমনটি হয়ে চলেছে?

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু থানার ভাটিয়ারীতে একটি ১২ তলা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। ৪ কোটি টাকা কনসালটেন্সি ফি দিয়ে আর বিস্তর সরকারী অর্থ খরচ করে নিজেদের রুচির উন্নত মান দেখাতে অনেক দামী দামী টাইলস ও পাথর এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা নানা সাইজের কাঁচের টুকরো দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে সেই ইমারত। দৃষ্টিনন্দন করতে কোটি টাকা ব্যয়ে নানা প্রকার লাইটিং ডিভাইস আর আরব দেশ থেকে এনে রোপণ করা হয়েছে নানা প্রকারের পাম গাছ। বছরে দুইটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিল্ডিং এর মূল অংশ জুড়ে প্রস্তুত করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বিশাল গোলাকৃতির হলরুম। তবে নকশার ত্রুটির কারণে সেখানে শব্দের অতিরিক্ত প্রতিধ্বনি হয় ফলে সেই হলরুমটি আর একেবারেই ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ১৩০ ফিট উঁচুতে হলরুমের গম্বুজে যে বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে তা কয়েক বছরের মাঝেই ফেটে গিয়ে পানি ডুকছে তাই বৃষ্টির সময় ঘরের মেঝেতে বালতি পেতে রাখা হয়। কাঁচগুলো নানা সাইজের আর বেশ দামী হওয়াতে সেগুলো এখন বদল করাও সম্ভব হচ্ছে না। বিল্ডিং এর বিভিন্ন কক্ষের মেঝেতে যে সব উন্নত টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে তার নিচে গ্যাস জমে গ্রেনেডের আদলে মেঝে বিস্ফোরিত হয়ে এ পর্যন্ত অনেকেই আহত হয়েছেন। বিল্ডিং এর বাইরে যে নানা রং ও ডিজাইনের পাথর লাগানো হয়েছে তার অনেকগুলোই খসে পড়েছে, দরজা ও অন্যন্য স্থানে যে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোও দুর্বল। এই ইমারতের কাজে যারা পরিকল্পনাকারী, আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, মিস্ত্রি, ও শ্রমিক ছিলেন তাদের সকলেই বিল্ডিং টির কাজের ভালো ও মন্দের সাথে যুক্ত। হয়ত ঐসব ব্যক্তিবর্গের কারগরি জ্ঞান ও সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু এই ইমারতটি তৈরির সাথে যুক্ত ঐ সকল মানুষের মাঝে যে নিজ কাজের প্রতি দায়িত্ববোধের সংকট ছিল তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই যে উদাহরণ, বস্তুত এটি কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং এদেশে সরকারী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজ, রাস্তা, বিল্ডিং এর শতভাগ নির্মাণকাজেই এমন হরির লুট, বিস্তর অপচয়, আর কাজের দুর্বল মান দেখা যায়।

জাতিয় চরিত্রের বর্তমান স্বরূপ অনুধাবন করতে এইরুপ মিলিয়ন মিলিয়ন ছোট বড় নানা উদাহরণ রয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে। সেইসব কালো উদাহরণে যুক্ত রয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বহু বিচারক, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সম্মানিত সম্পাদক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পর্যায়ের মানুষ। আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নানা অপকৌশলে নিরীহ মানুষের নামে ড্রাগসহ নানা প্রকার মামলা জুড়ে দিয়ে গণমানুষের উপর জুলুম করেছে। কাঁচা মরিচ, ডিম,পিয়াজ, চাল, চিনি নিয়ে সিন্ডিকেট করে জনজীবনের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে দেয়া ছিল এদেশের ধনী ব্যবসায়ীগনের চরিত্র। ছাত্রদের একটি সুবিধাপ্রাপ্ত দল অন্য নিরীহ ছাত্রদের উপর অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিশোটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে। এখানে বিগত বছরগুলোতে অধিকাংশ নেতা, সংগঠক ও সমাজসেবকগণ নানা কৌশলে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি আর আত্মপ্রচারেই ব্যস্ত থেকেছেন। ন্যায়-অন্যায়বোধকে উপেক্ষা করে আপন আপন কমিশন বাড়িয়ে নেয়ার অভিপ্রায়ে প্রকৌশলীগণ যেসব রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ ও বড় বড় ইমারত তৈরি করেছেন তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত ঠুনকো। নতুন নতুন প্রকল্পে টাকা খরচ করতে হবে তাই স্যাটেলাইট কেনা হয়েছে, চীন থেকে ঋণ করে প্রায় ১০৭ বিলিয়ন টাকা খরচে কর্ণফুলী টানেল তৈরি করা হল কিন্তু সেই টানেলটি ঠিক কি কাজে লাগবে তা নির্ধারণ করা হল না। টানেলটিতে এখন প্রতিদিন গড়ে ১২ লক্ষ টাকা টোল আদায় হয় যার বিপরীতে টানেলটির মেইন্টেন্যান্স খরচ দৈনিক প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা (প্রথম আলো, ২৭ মে ২০২৪)। যেদেশে এখনও অসংখ্য দরিদ্র মানুষ ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকে, যেখানে এক কোটি বেকার যুবক অনিশ্চিত জীবন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেই দেশের দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক নেতাদের কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের পদে পদে বসে থাকা শিক্ষিত উচ্চপদস্থ অফিসার, প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ীগণ যারা এইসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন তাদের দায়িত্ববোধ, বিবেক ও লজ্জাবোধের অনুভূতি কেমন হতে পারে?

২.১ গবেষণার প্রশ্ন

বিগত দশকে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগসুত্রে লুটপাট আর দুর্নীতিতে একদিকে যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল এরই মাঝে অনেকটা দৃষ্টির অগোচরে বেড়ে উঠেছিল বুদ্ধিদীপ্ত এক আত্মসম্মানী প্রজন্ম আজ যারা জেন-জি বা জেনারেশন জেড নামে পরিচিত হয়েছে। এরা সেইসব সাধারণ জনগণের সন্তান যারা আজীবন নির্যাতিত হয়েছেন। এই প্রজন্ম তাদের পিতামাতাকে বিগত সরকারের দুর্বৃত্ত আচরণে নিষ্পেষিত ও লাঞ্চিত হতে দেখে দেখে, অপমান আর অসীম বৈষম্যের চাদরে নিজেদের বন্দি দেখতে দেখতে তাদের আত্মসম্মানবোধ একদিন স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠল। তরুন শিক্ষার্থীরা নেমে এল রাজপথে, হায়েনার বুলেটের সামনে আত্মসম্মানের প্রতীক

হয়ে বুক পেতে দিল সাইদ, প্রিয়, মোহাম্মাদ আমিন আর মুগ্ধরা। হাজার হাজার শিশু-কিশোর-যুবকের প্রানের বিনিময়ে বাংলাদেশ নতুন করে স্বাধীন হল ৫ই আগস্টের রোদ্রজ্জল দুপুরে। ইতিহাসবিদগণ বলেন ২৩ জুন ১৭৫৬ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিল, তারপর প্রায় ১৯০ বছর পর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে এই ভূমি একবার স্বাধীন হয়েছিল। ১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার এদেশ স্বাধীন হয়েছিল পাকিস্থানি হানাদারদের বিরুদ্ধে আর ৫ই আগস্ট ২০২৪ এ তৃতীয়বার স্বাধীন হল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ এইভাবে আর কতবার বাংলার মানুষকে স্বাধীন হতে হবে? সত্যিকার মুক্তির স্পর্শ পেতে আর কত জীবন দিতে হবে এদেশের মানুষকে। অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, কেন এদেশের মানুষ বারংবার পরাধীন হন?অধিকার রক্ষায় এদেশের মানুষ কি যথেস্ট আত্মসচেতন নন? স্বাধীনতা শব্দটির মাঝে লুকিয়ে থাকা দায়িত্ববোধের চেতনাটিকে কি বঙ্গালি লালন করতে শিখেছেন?

গণ-আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে; লুটেরার দল পালিয়েছে; আবার তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ধরা পড়ছে এবং তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। তবে বিচার করে ১০ কিংবা ৫০ অথবা ৫০০ জন ঐরুপ লুটেরাকে শাস্তি দিলেই কি এ দেশ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে? বিগত দশকগুলোতে জাতির মূল্যবোধ ধংসের মধ্য দিয়ে যে মিলিয়ন মিলিয়ন লুটেরার ডিম্বানু এ জাতির অন্তরে গ্রথিত হয়েছে সেসব ডিম্বাণু সুযোগ পেলেই কি নতুন নতুন লুটেরার জন্ম দিবে না? এই দেশের সহজ সরল মানুষের আবেগকে কৌশলে পুঁজি করে নতুন নতুন দুর্বৃত্তের দল কি আবার রাষ্ট্রের সব কিছুকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে লুটের উৎসব করবে না? আবারও কি এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা ঐসব রক্ত পিপাসু বুভুক্ষ রাক্ষসদের গ্রাসে পরিণত হবে না? হায়েনার দল লোভ দেখিয়ে আবারও কি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক ও বিচারকদের পকেটে পূরে তাদেরকে নানা অন্যায় কাজে নিযুক্ত করবে না?

তাই,রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অনিয়ম আর দুর্নীতি শেকড় গেঁড়ে বসেছে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তির উপায় খুঁজতে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির মূল উৎস খুঁজে বের করা প্রয়োজন। জননিরাপত্তা অর্জন ও জাতিকে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন করতে একটি মজবুত জাতিসত্ত্বার গঠন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নাকি অবকাঠামোর উন্নয়ন অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করা সবথেকে মূল্যবান প্রয়োজন? এই প্রয়োজনবোধ থেকেই জনজীবনের নিরাপত্তাকে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করার উপযুক্ত পথ খুঁজে পেতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে হাজারো সমস্যার মূল শেকড়টি বের করে আনার প্রচেষ্টা রয়েছে এই গবেষণায়। এই অধ্যয়নে যে মৌলিক প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজতে চেষ্টা করা হয়ছে তা হল,'একটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য জাতির কোন নিয়ামকটি সর্বোচ্চ ভুমিকা রাখে*?'*

৩.১ অধ্যয়নে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

আত্মসম্মানবোধ (Self-esteem). আপন সত্ত্বার বিষয়ে আপন মূল্যায়নই আত্মসম্মান, যা বিজয় কিংবা হতাশা, গর্ব কিংবা লজ্জার অনুভূতি দিয়ে গঠিত বিশ্বাসের মূল্যায়ন (রোজেনবার্গ, ১৯৬৫)। তবে এই অধ্যয়নে আত্মসম্মান বলতে একজন মানুষের এমন একটি মূল্যবোধের অনুভূতিকে বোঝান হয়েছে যা একজন মানুষকে তার চারপাশের অন্যসব মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের জন্য সার্বজনীন ও কল্যাণকর আচরণে অন্তর থেকে অনুশক্তি যোগায়। আত্মসম্মানবোধ এমন অনুভূতি যা মৌলিকভাবে সহজাত তবে পরিবেশের প্রভাবেই এই অনুশক্তির ব্যপ্তি ও দিক নির্ধারিত হতে পারে। ভ্রান্ত আত্মসম্মানবোধ মানুষকে অহংকারী করে দিতে পারে অন্যদিকে সঠিক আত্মসম্মানবোধ মানুষকে অধিক বিনয়ী, মঙ্গলকামী ও আত্মত্যাগী আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

জননিরাপত্তা (Human Security). UNDP -১৯৯৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সব ধরণের চাহিদা থেকে মুক্তি এবং সব রকমের ভয় থেকে মুক্তিই (free from need and free from fear) জননিরাপত্তার দুইটি মৌলিক দিক। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী জননিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সাতটি নিয়ামক চিহ্নিত করা হয়েছে (physical security, food security, health security, environmental security, community security, economic security and political security) যা অর্জিত হলে জননিরাপত্তা অর্জন হয়েছে বলে ধরা যায়।

দুর্নীতি (Corruption). ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতিকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে আর বিশ্বব্যাংক এর মতে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী পদের অপব্যবহারই দুর্নীতি। তবে এই অধ্যয়নে দুর্নীতি বলতে খারাপ নীতি বা সব ধরণের ক্ষতিকর আচরণকেই বোঝানো হয়েছে। এখানে দুর্নীতি বলতে শুধু অবৈধ উপায়ে অর্থ কিংবা সুবিধা গ্রহণ করাকেই সীমাবদ্ধ করা হয় নাই বরং এমন সব ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ছোট ও বড় আচরণকে বোঝানো হয়েছে যা অন্য কোন মানুষ, প্রাণী কিংবা পরিবেশের ক্ষতি বা ক্ষতির অভিপ্রায়ের বিনিময়ে ব্যক্তির ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

৪.১ পূর্বতন গবেষণার সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর দেশে দেশে নানা পর্যায়ে নানা প্রেক্ষাপটে জাতীর নিরাপত্তা এবং জননিরাপত্তা বিষয়ে প্রতিদিনই বিস্তর গবেষণা, আলোচনা, মত বিনিময়, টক শো ইত্যাদি হয়ে চলেছে। জগতব্যাপী গবেষকগণ জাতীয় জীবন ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে নানা তাৎপর্যপূর্ণ মতামত তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত যা প্রথাগত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বাইরে প্রসারিত। এই ধারনাটি ক্ষুধা, রোগ এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নের মতো দীর্ঘস্থায়ী হুমকির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক সংকট এবং সংঘর্ষের মতো আকস্মিক ব্যাঘাত থেকে মানুষকে সুরক্ষার উপর জোর দেয় (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি -১৯৯৪)। আবার গবেষকগণ বলছেন, একটি রাষ্ট্রের সুসজ্জিত এবং সক্ষম বাহিনীগুলোই জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার ভিত্তি কারণ এটি যে কোন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক এবং যে কোন প্রকার হুমকির মুখে জাতিকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে কাজ করে। তাদের মতে, উন্নত প্রযুক্তি এবং সু-প্রশিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গঠিত শক্তিশালী বাহিনী একটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বার্থ রক্ষা করতে পারে (কর্ডসম্যান, ২০১৭)। আবার অন্য গবেষকগণ বলেছেন, ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিশ্বে, বুদ্ধিমত্তা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সবথেকে জরুরী (ক্লার্ক ও কেইক, ২০১৯)।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি -২০০৯ এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুশাসন দেশের জননিরাপত্তার একটি মৌলিক প্রয়োজন কারণ এটি মানবাধিকার সুরক্ষা, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং আইনশৃঙ্খলার প্রয়োগ নিশ্চিত করে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিকদের চাহিদার প্রতি মনোযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং আইনের শাসনের প্রচার। এই প্রচেষ্টাগুলি রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করে, সংঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং আরও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে। আবার অর্থনীতি বিষয়ের গবেষকদের মতে দীর্ঘমেয়াদী জননিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অর্থনীতি সবথেকে বেশি গুরুত্ব বহন করে। তাদের মতে অর্থনৈতিক শক্তি একটি জাতিকে প্রতিরক্ষা তহবিল, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অবকাঠামো বজায় রাখতে সক্ষম করে তোলে ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সম্ভাবনা হ্রাস এবং বৈশ্বিক বিষয়ে জাতির অবস্থানকে শক্তিশালী করে দেয় (ব্লাকউইল ও হ্যারিস, ২০১৬)। রাজনীতি নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সক্ষমতা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে, একটি দেশ সকল প্রকার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত বিষয়ে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে আর এভাবেই যৌথ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারে (হাস, ২০২০)। তারা জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাস করে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রতি গুরুত্ব দেয়। ইউএনডিপি (১৯৯৪) অনুসারে,

দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস হলে সংঘাতের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে এবং সামগ্রিক জননিরাপত্তা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আরজিনের মতে (২০২০)শক্তির উৎপাদন ও শক্তির ব্যবহারই আধুনিক সভ্যতার মৌলিক চালিকা তাই শক্তির নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করা জন নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যদিকে ফ্লিন মনে করেছেন,পরিবহন, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সকল প্রকার সেবামুলক কাজের অবকাঠামো উন্নয়নের মাঝেই রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তার চাবি। তার মতে উপযুক্ত অবকাঠামোগুলোকে দুর্যোগ,দুর্বিপাক,আক্রমণ এবং অন্যান্য সকল বাধার মাঝে কার্যকরী করে রাখার সক্ষমতা সৃষ্টি করা হলে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সঙ্কটকালেও মানুষকে শান্ত রেখে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে (ফ্লিন, ২০০৭)। আবার মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে গোস্টিন মনে করেন, জনগণকে মহামারী ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাই জননিরাপত্তার মূল অংশ (গোস্টিন, ২০২০)।

সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জীবন রক্ষাকারী উপকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়ে তাই রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই কূটনীতির মাধ্যমে সংঘাত প্রতিরোধ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংলাপ বাড়ানো এবং সহিংসতার মূল কারণ যেমন বৈষম্য, সম্পদের ঘাটতি এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে (জাতিসংঘ ২০১২)। উপরন্তু, সংঘর্ষ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার এবং শান্তি বিনির্মাণ, নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য (জাতিসংঘ ২০১২)। রটবার্গ এর মতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কার্যকর শাসন ব্যবস্থা জননিরাপত্তার মূল ভিত্তি। সুশাসন নিশ্চিত করা, উপযুক্ত আইন ও সেসব আইনকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা এবং জাতীয় সম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং জাতীয় সংহতির উন্নয়ন ঘটে(রটবার্গ, ২০১৪)। পুটনাম বলেন যে,জাতীয় পরিচয়ের দৃঢ় অনুভূতি বা জাতীয়তাবোধের অনুভব এবং সামাজিক সংহতিই যে কোন রাষ্ট্রের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ হুমকির বিরুদ্ধে একটি জাতিকে সবথেকে বেশি শক্তিশালী করে রাখে। তার মতে,জনসাধারণ যখন একত্রিত হয়ে সরকারের প্রতি আস্থা রাখে,তখন জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন সংকট মোকাবেলা সহজ হয় (পুটনাম, ২০০০)। অন্যদিকে সার্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তার প্রয়োজনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং পরিবেশগত নিরাপত্তাকে জন নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছে। পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো জনগণের মাঝে নানা প্রকার দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিতে পারে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে, দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধানে অগ্রাধিকার অপরিহার্য (সিএনএ কর্পোরেশন, ২০০৭)।

উপরে উল্লেখিত গবেষণাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিংবা পরিবেশগত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঐসব গবেষণা থেকে যেসব শিক্ষা ও জ্ঞান উঠে এসেছে তা নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত মূল্যবান। তবে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের জীবনে তাদের ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত,আবেগগত ও রাজনৈতিক অধিকারসহ সব রকমের চাহিদার নিরাপত্তা সমুন্নত রাখতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন কোনটি তা খুঁজে বের করাই আমাদের লক্ষ্য।

৫.১ গবেষণার পদ্ধতি

সামাজিক বিষয়ের গবেষণায় Mixed Method Technique আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেরা পদ্ধতি(ব্রাইম্যান,২০০৬) যা সমাজের কোন জটিল বিষয়ের সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে (তাশাক্করি ও টেড্ডলাই,২০১০)। একটি সঠিক উপসংহারে পৌঁছুতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ডাটা সংগ্রহ ও সেসব ডাটার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করতে Mixed Method Technique অত্যন্ত কার্যকরী (ক্রেসওয়েল ও প্লানোক্লার্ক,২০১৮) । তাছাড়া এই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ট্রাইয়াংগুলেশনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারা সম্ভব হয় (ঝিক,১৯৭৯)। সঙ্গত কারনেই Mixed Method Technique ব্যবহার করে আমাদের এই অধ্যয়নটি Sequential Explanatory Design এ প্রথমে কেস স্টাডি দিয়ে শুরু করে তারপর কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামত ও বিশেষজ্ঞগনের ইন্টারভিও থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে একটি উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.২ উপসিদ্ধান্ত

জনজীবনের সার্বিক নিরাপত্তাকে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করার উপযুক্ত পথ খুঁজে পেতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে হাজারো সমস্যার মধ্য থেকে যে মৌলিক প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজতে চেষ্টা করা হয়ছে তা হল, ‘বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে জাতির কোন নিয়ামকটি সর্বোচ্চ ভুমিকা রাখবে? সম্ভাব্য প্রয়োজন হিসেবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি, আইন রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি,

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, সংবিধানের দুর্বলতা ও আইনের সংশোধন, অথবা জনমানুষের মাঝে আত্মসম্মানবোধ থেকে সৃষ্ট দায়িত্ববোধের মোটিভেশনকে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে এই গবেষণায় নিম্নবর্ণিত তিনটি উপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

উপসিদ্ধান্ত -১। এদেশের প্রধান সমস্যাটি রাজনৈতিক তাই সে সমস্যা সমাধানে যদি সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন আয়োজন করা যায় তবে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবে এবং জনগণের পছন্দের সরকার জনগনের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

উপসিদ্ধান্ত -২। বেকারত্ব, দারিদ্র ও অর্থ-সম্পদের অভাবই এদেশের মূল সংকট তাই পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের আয়োজন করা গেলে এদেশের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

উপসিদ্ধান্ত -৩। বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকাটিই ছিল বিগত দশকগুলোতে এদেশের মূল সংকট।

উপসিদ্ধান্ত -৪। এদেশের সকল অনিয়ম, অন্যায়ের ও দুর্নীতির সমস্যাটি জাতির মূল্যবোধের সাথে যুক্ত তাই নাগরিকদের মাঝে উচ্চ আত্মসম্মানবোধের মানসিক অভ্যাস মজবুত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে সব ধরণের অন্যায় হ্রাস করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকগণ আত্মসম্মানবোধের অনুশক্তিতে নিজেরা অন্যায় কর্ম করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি স্তরে অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য একতাবদ্ধ থাকবে।

৫.৩ গবেষণায় ব্যবহৃত তত্ত্বগত কাঠামো

এই গবেষণার বিষয়বস্তু স্যার আলবার্ট বান্দুরার সোশ্যাল লার্নিং তত্ত্বের (বান্দুরা, ২০০৯) আলোকে অগ্রসর হয়েছে। তত্ত্বের মূলে রয়েছে ‘ মানুষ তার চারপাশের পরিবেশে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করে সেসব থেকেই তাদের আচরণ গঠিত হয়’। এই তত্ত্বের আলোচনা স্পষ্ট করে যে মানুষের চিন্তা, আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আকাংখা ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত। তত্ত্বটির আলোকে বলা যায়, কোন জাতির অধিকাংশ মানুষের আচরণ তেমনই হয় যা কিছু তারা পরিবেশে প্রতিনিয়ত দেখে বা পর্যবেক্ষণ করে অভ্যস্ত। তাই অধিক অর্থবিত্ত, ক্ষমতা আর ভোগের প্রচার জাতির আচরণকে

আরও অধিক অর্থবিত্ত অর্জন ও ভোগ-উপভোগের প্রতিই আকৃষ্ট করে। ফলে এমন জাতির মাঝে বিত্তবৈভব অর্জন করা, পদোন্নতি লাভ করা আর ভোগের মানদণ্ডে নির্ণীত হয় মর্যাদার মানদন্ড। স্বাভাবিকভাবেই ভোগের মানদণ্ডে নির্ণীত মর্যাদাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায় উপেক্ষা করে যে কোনভাবেই হোক অধিক অর্থবিত্ত অর্জনের প্রতিই আকর্ষণ করে, ফলাফলে দেখা যায় জাতির সর্বস্তরে লাগামহীন দুর্নীতির বিস্তার।

অন্যদিকে যে জাতির মাঝে স্বল্প আহার, স্বল্প উপভোগ, স্বল্প পরিধান, সহযোগিতা, ও সহিষ্ণুতাকে সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে অধিকাংশ মানুষের আচরণে দায়িত্ববোধের অনুশক্তি বিকশিত হতে দেখা যায়। এমন মূল্যবোধের মানুষেরা অন্যদের কাজে সহযোগিতা এবং যে কোন প্রাপ্তির বিষয়ে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাঝে আত্মমর্যাদা অনুভব করেন ফলে জাতীয় জীবনে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অন্যায় হ্রাস পায়। ফলাফলে, এমন মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতির মাঝে একে অন্যকে সহযোগিতা করার পরিবেশ উন্নত থাকে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও তারা দুর্ভোগের সাথে নিজেদের জীবন যাপন উপযুক্তভাবে মানিয়ে নিয়ে জননিরাপত্তাকে মজবুত রাখতে পারে।

৫.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত মূল ধারনা

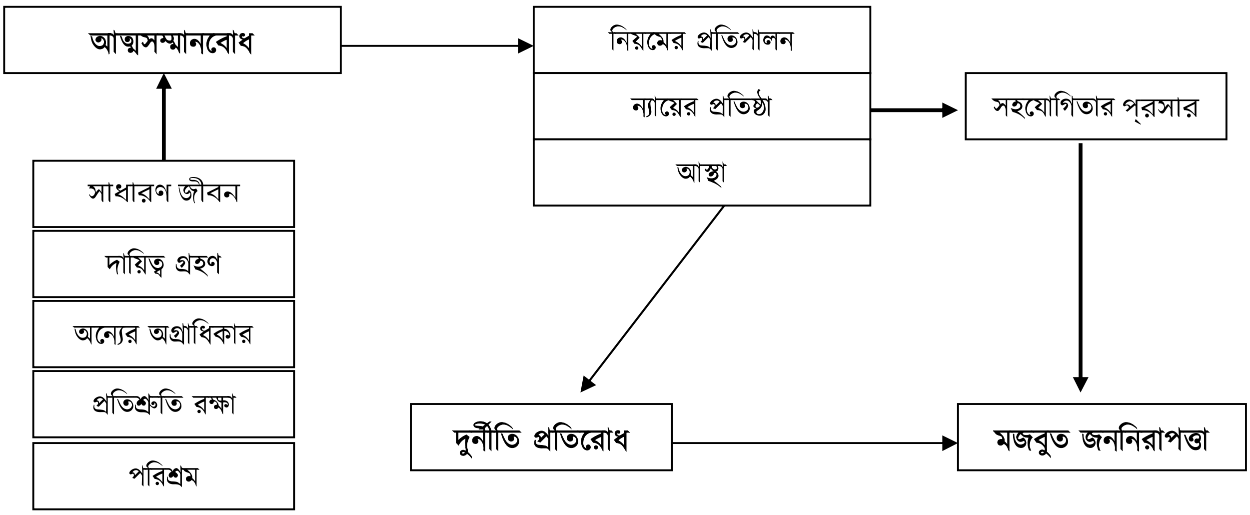

৬.১ তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের পর্যালোচনা

৬.১.১ আগস্ট ২০২৪ এর গণ- অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ – একটি কেইস স্টাডি

বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শ থেকে জানা যায় যে রাজনৈতিক দলের সকলেই বিশ্বাস করেন, দেশ জনগণের সম্পদ তাই এদেশে জনগনের অধিকারই সর্বোচ্চ। তাদের মতে, জনগণই দেশের মালিক আর সরকারী বেতনভুক্ত ও সরকারী অর্থ থেকে যে কোন প্রকারের সুবিধা ভোগ করা সকলেই এই দেশের জনগনের সেবক। তথাপিও ১৯৭১ পরবর্তী পাঁচ দশক ধরে জনগণের সেবা করার শপথ নিয়ে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একাকী কিংবা জোটবদ্ধ হয়ে এদেশে সরকার গঠন করেছিল তাদের প্রতিটি সরকারের আমলেই জনগণ বনাম সরকার বিষয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রকার সংঘাত। এ সময়ে জনগণের সেবার শপথ নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণকারী সেইসব সরকারই নানা কৌশলে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন শুরু করেছিল। দেশের যে সামান্য পরিমান প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয় সম্পদ হিসেবে মজুত ছিল, সেই গ্যাসটুকু বিদেশে বিক্রি করার জন্য যে তীব্র আগ্রহ সেইসব সরকার দেখিয়েছিল তা কল্পনাতীত। শুধু গ্যাস নয়, রাষ্ট্র জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিস্তর অস্পস্টতার মাঝে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে লাগামহীন দুর্নীতি শুরু হয়েছিল তা সরকারী দলের নানা পর্যায়ের নেতা, ব্যবসায়ী আর এক শ্রেণির সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও বিলাসী জীবন যাপনে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

সে সময়ে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে সরকারী দল নানা অজুহাতে বিরোধী দল ও ভিন্ন মতাদর্শকে দমিয়ে রাখতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জনমানুষের দাবিকে কখনও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সমাধান করার নজির দেখা যায় নাই। ১৯৭১ উত্তর বাংলাদেশে সব সরকারের আমলেই কমবেশি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, জনগণের জান –মালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থেকে সরকার নিজেই কেন ঐরুপ দমন-পীড়ন, গুম, নির্যাতন ও হত্যা করার মত নিকৃষ্ট আচরণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে? ক্ষমতার চেয়ারে বসে থাকা ঐসব নেতা কর্মীদের নিকট এত বেশি আকাঙ্ক্ষিত কেন?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোটা দাগে তাদের ঐরুপ আচরণের মুলে মাত্র একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ চিহ্নিত করা যায় – দায়িত্ব নিতে নয় বরং ক্ষমতার চেয়ারে বসে ভোগ আর উপভোগ করতেই রাজনৈতিক দলের নেতাগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছিল। বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পর দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার পরেও অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আচরণে লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের সম্পদকে তারা নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির তালিকায় তুলে নিতেই রাজনীতিকে ব্যবহার করেছে। ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমান আকাশচুম্বি করতে তাই তারা অন্যায় দখলদারিত্ব, দস্যুতা, ঘুষবানিজ্য,সিন্ডিকেট করা, স্বজনপ্রীতি,ও দলপ্রীতির মাঝেই ডুবে থেকেছে সর্বদা। নিজেদের ভোগবিলাসকে চিরস্থায়ী করার কৌশলে সরকারী কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী, ছাত্র সমাজ সব ক্ষেত্রেই তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দুর্বৃত্তের শক্তিশালী নেক্সাস গড়ে

নিয়েছিল। দুরবিসন্ধিকে আরও পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে বার বার তারা বিদেশী স্বার্থবাদী শক্তিকে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরই মাধ্যমে রাজশক্তিকে টিকিয়ে রাখার কৌশল করেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার লক্ষ্যে তারা বারংবার সংবিধান পরিবর্তনসহ নানা প্রকার আইন করে নিয়েছিল যেন রাজক্ষমতা চিরস্থায়ী করা যায়। গণমাধ্যমকে পুতুল হিসেবে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার জন্য তারা সাংবাদিক আর মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নানা লোভ ও ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল। দেশের বিবেক বলে পরিচিত শিক্ষক সমাজকে তারা দলীয় আনুগত্যে বাধ্য করেছিল। গত এক দশক ধরে দলীয় আনুগত্যের সাথে সাথে ঘুষের অর্থ উপযুক্ত পরিমান না হলে সরকারী চাকুরি পাওয়া সম্ভব ছিল না কোন দপ্তর বা অধিদপ্তরে। বিরুদ্ধমতের কন্ঠরোধ করতে যুব সমাজের একাংশের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও অঢেল অর্থ দিয়ে তারা নিজেদের পেশিশক্তি মজবুত করে রেখেছিল। মানুষের স্বাধিকারবোধের চেতনা নষ্ট করে দিতে তারা মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে অপশিক্ষার প্রচলন ঘটিয়েছিল।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর বৈষম্যহীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করে ১৯৯০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে তথাপি যারাই দেশ সেবার দায়িত্ব নিয়ে সরকার গঠন করেছে পরবর্তীতে তারাই নানা কৌশলে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারেই অধিক তৎপর ছিল। এভাবেই ২০২৪ এর ৫ই আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে কখনও এই দল আবার কখনও সেই দল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু তারা একই মুদ্রার দুই পীঠ হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। দুইটি দলই প্রতিযোগিতা করে দুর্নীতি, দমনপীড়ন আর অনিয়মের প্রসার ঘটিয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি ইত্যাদি পদে ছিলেন তাদের অধিকাংশই নামে বেনামে বিস্তর অর্থের মালিক বনে গেছেন এ সময়ে। আরব মরুভুমির তপ্ত বালিতে পুড়ে, ইউরোপের ভুমধ্যসাগরে ডুবে বাঁচামরার সংগ্রাম করে এদেশের গরীব শ্রমিকেরা যেটুকু উপার্জন করে এনেছিল তাদের সেই শতকষ্টে উপার্জিত অর্থটুকু নানা কৌশলে চুরি করে বিদেশে পাচার করে নিয়ে গেছে সেই সব কথিত দেশদরদী নেতা আর তাদের দোসররা।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসের হিসাব মতে বাংলাদেশ প্রায় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত যার একটা বড় অংশ দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বস্তুত বিগত কয়েক দশক ধরে চারিদিকে বিরামহীন দুর্নীতি দেখে দেখে এদেশের সাধারণ মানুষের মাঝেও দুর্নীতির ভাইরাস ঢুকে এখন সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গলা চেপে ধরেছে। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি শুধু অর্থবিত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং মানুষের চাতনার মাঝেও দুর্নীতি স্থান করে নিয়েছে। শুধু সরকারী দপ্তর নয় বরং অবস্থা এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে সাধারণ সবজি, মাছ কিংবা ফল বিক্রেতাও নানা কৌশলে ক্রেতাকে ঠকিয়ে চলেছেন। সুযোগ পেলে একজন রিক্সাচালকও তার যাত্রীকে ঠকিয়ে কিছু বেশি উপার্জন করে নিতে চাইছেন। জীবন রক্ষাকারী ঔষধে ভেজাল দেয়া হচ্ছে;রেস্টুরেন্টগুলোতে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি করা

হচ্ছে; টিকিট কালবাজারি করে রেলকর্মকর্তাগণ ফুলে ফেপে উঠেছেন; গ্রামের বখাটে ছেলেদের হাতে চলে গেছে বিস্তর অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র। কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের কেউ কেউ আজ শত কোটি টাকার মালিক। চতুর্থ শ্রেণির চাকুরিজীবী শুধু ফাইল ওলট পালট করেই হাজার কোটি টাকা কামায় করেছেন। দলীয় আনুগত্যে পাশ করলেও ঘুষ ছাড়া চাকুরি পাওয়া যায় না;আবার ঘুষের অংক বেশি না হলে ভালো পোস্টিং পাওয়াও দুষ্কর। প্রকৌশলীগণ কমিশন ছাড়া কাজ করেন না, অফিসের পিয়ন শত কোটি টাকার মালিক, বিসিএস কিংবা মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় অহরহ; টাকা দিলেই মেলে নানা উচ্চশিক্ষার সনদ। বস্তুত, এদেশে দুর্নীতি হয় না এমন কোন সেক্টর খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

বলাই বাহুল্য, এখানে বিগত দশকে সরকারে বসে থাকা অধিকাংশ বড় বড় নেতা আর তাদের দোসররা যে বিস্তর অর্থবিত্ত দিয়ে বিদেশে বাড়ী গাড়ি করেছেন, সন্তানদের বিদেশে পড়িয়েছেন, বেগম পাড়া বানিয়েছেন তার সবই জনগণের অর্থ। যে অর্থ দিয়ে সাধারণ মানুষদের মৌলিক প্রয়োজনে জননিরাপত্তার নিয়ামকগুলোকে মজবুত করা দরকার ছিল সেইসব অর্থ চুরি করে বিদেশে সেকেন্ড হোম বানানো হয়েছে। একদিকে দুর্নীতিবাজদের দল একে অন্যকে টেক্কা দিতে প্রতিযোগিতা করেছে অন্যদিকে অসহায়ভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। যে জনগণের ঘাম ও পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র কেনা হয়েছিল সেইসব অস্ত্র দিয়েই সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা জনমানুষের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু বিধি বাম, যে জাতিকে বিগত ৩০ বছর নানাভাবে নিষ্পেষিত করে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল তাদেরই শিশু সন্তানেরা আত্মসম্মানের অমর্যাদাকে আর মেনে নিতে পারে নাই। পুলিশের বন্দুকের সামনে আত্মসম্মানবোধের তীব্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সাইদ, প্রিয়, মোহাম্মদ আমীন আর মুগ্ধসহ হাজারো শিশু-কিশোর-যুবক। মাথা উঁচু রেখে হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল কোটি কোটি মানুষের আধামরা অন্তরে। একদিন যে হৃদয় ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, একদিন যে অভিভাবকরা শুধুই জুলুম নির্যাতন সহ্য করে মাথা নিচু করে জীবন যাপন করত – সেই আধামরা প্রবীণদের তারা শিখিয়ে দিল কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয়, কীভাবে আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সব বাঁধা ছুড়ে ফেলে কারফিউ ভেদ করে লক্ষ লক্ষ জনতা গণভবন দখল করে নিলে এতদিনের অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠী সব কিছু ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

৬.১.২ কেইস পর্যালোচনাঃ

বিগত পাঁচ দশকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে তার পেছনের মৌলিক কারণটি কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কার্যকারণ তত্ত্ব বা Cause and Effect Theory টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির বিস্তার এবং দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নিজেদের

অধিকার রক্ষা করতে না পারার বিষয়ে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত উপসিদ্ধান্তগুলোর বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলঃ

উপসিদ্ধান্ত -১। এদেশের প্রধান সমস্যাটি রাজনৈতিক তাই সে সমস্যা সমাধানে যদি সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন আয়োজন করা যায় তবে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবে এবং জনগণের পছন্দের সরকার জনগনের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

উপসিদ্ধান্ত -১ কে চ্যালেঞ্জ করে বলা যায় এদেশের বিগত ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে সত্যটি স্পষ্ট তা হল, জনগণের পছন্দের সরকার অল্পদিনের মাঝেই জনগনের মৌলিক অধিকারটুকু হরণ করে নিজেদেরকে রাজা আর জনগণকে প্রজা বানিয়ে শাসন ও শোষণ করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা এমনকি ব্রিটিশ ও পাকিস্থানিদেরকেও হার মানিয়েছে। বিগত ৫০ বছরে সরকারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশরাই দেশের অর্থ চুরি করে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িয়েছে;এবং বিরোধীদের নিঃশেষ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তারা যা কিছু প্রয়োজন তার সবই করেছে। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত আইন করে নিয়েছে, বিদেশীদের সাথে নানা প্রকার দেশবিরোধী চুক্তি করে লুটপাট করেছে এমনকি সেসব চুক্তি জনগণকে জানানোর প্রয়োজনটুকুও বোধ করে নাই। নিজে ও নিজেদের দল মতের ব্যক্তিবর্গকেই তারা নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাধারণ জনগনকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে সরকার ও রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতাকর্মীদের সাথে সাথে সে সময়ে অনেক সংখ্যক সাধারণ জনগনের মাঝেও দায়িত্বহীন আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। এদেশে টাকা দিয়ে ভোট কেনাবেচা কিংবা অর্থের বিনিময়ে জনসভায় যোগদান, রাজপথে আন্দোলন, হরতালে পিকেটিং ইত্যাদি সবই হয়েছে। এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাঝে যে মৌলিক মোটিভেশন অনুভূত হয় তা হল, যেকোন ভাবেই হোক ক্ষমতার চেয়ারটি দখল করা – কিন্তু কেন এই মোটিভেশন? যিনি বা যারা জান-প্রান দিয়ে ক্ষমতার চেয়ার পেতে চেষ্টা করেন কিংবা যারা প্রচুর অর্থ খরচ করে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সচেষ্ট থাকেন তারা কি সত্যিই দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য? এই সহজ প্রশ্নটির বিষয়ে এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষও সচেতন নন। যেখানে জনগণ তাদের নেতা নির্বাচনে যথেষ্ট সচেতন নন সেখানে স্পষ্টতই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন কিংবা রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদের নিকট দেশের দায়িত্ব প্রদানই দেশের মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

উপসিদ্ধান্ত -২। বেকারত্ব, দারিদ্র ও অর্থ-সম্পদের অভাবই এদেশের মূল সংকট তাই পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের আয়োজন করা গেলে এদেশের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

উপসিদ্ধান্ত -২ কে চ্যালেঞ্জ করে বলা যায়, ধরুন যদি কোন আলাদীনের চেরাগ থেকে পাওয়া বিস্তর অর্থ সম্পদে আজই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভরে ওঠে তবুও কি অনিয়ম, দুর্নীতি আর অপশাসন ঘুচবে? নাকি,আলাদীনের চেরাগ থেকে পাওয়া সেই অর্থ সম্পদ কীভাবে ভাগ হবে, সেই সম্পদ থেকে কে কতটা বেশি দখল করবে সেই প্রতিযোগিতা থেকে নতুন করে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে। ৩০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা পদ্মা সেতু পরিদর্শন শেষে প্রেস ব্রিফিং এ জানান যে, তারা কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফলে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রকল্প ব্যয় প্রায় ১৮২৫ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, যদি পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় একটা ভালো সরকার দায়িত্বে থাকতেন তবে সেতু নির্মাণের খরচ অনেকাংশে কম রাখা সম্ভব হত। এদেশে বিগত দশকে শেখ পরিবারের সবথেকে কনিষ্ঠ সদস্য থেকে শুরু করে ধনকুবের ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমান, মি সাইফুল আলম কিংবা মি শাহ আলম গংদের অর্থ সম্পদের কোনই অভাব ছিল না, অথচ বিগত কয়েক দশক জুড়ে ওরাই সবথেকে বেশি লোভী আচরণ করেছে। নিশ্চিতভাবেই বেকারত্ব একটি বড় সংকট কিন্তু সম্পদ নাকি সম্পদের সুষম বন্টন, কোনটি বৈষম্যবোধের জন্ম দেয়? বস্তুত শুধু এদেশেই নয় বরং জগতব্যাপী সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থাতেই নানা সংঘাতের জন্ম হতে দেখা যায়। তাহলে কি এমন মৌলিক শক্তি রয়েছে যা কোন রাষ্ট্রে সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে?

উপসিদ্ধান্ত -৩। বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকাটিই ছিল বিগত দশকগুলোতে এদেশের মূল সংকট।

উপসিদ্ধান্ত -৩ কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত যৌক্তিক বলে মনে করা যেতে পারে। তবে ধরুন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেশপ্রেমিক ও প্রজ্ঞাবান উপদেষ্টাগণ দিনরাত পরিশ্রম করে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এদেশে একটি উৎকৃষ্ট সংবিধান, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। ধরুন নানা প্রকার সংস্কারের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হল তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন হল, পুলিশ বাহিনী স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা পেল। তবে একসময় স্বাভাবিকভাবেই দেশ পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কোন একটি রাজনৈতিক দল দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এরপর সেই রাজনৈতিক দলের সরকারের সাথে কাজ করতে থাকা প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, আইন,ও সংবিধান যে সুষ্ঠু পথেই চলবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? আপন আপন ব্যক্তি স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনিতিক, বিচারক,নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, সকলে মিলে একত্রে যে দুর্বৃত্তের নতুন নেক্সাস সৃষ্টি করবে না তার নিশ্চয়তা কীভাবে অর্জন করা যাবে? সব শক্তি এক হয়ে পুনরায় কোন স্বৈরাচারী

সরকারের সাথে মিশে জনগনের টাকায় কেনা অস্ত্র যে জনগনেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সেখানে রাজশক্তির প্রভাবে আইনগুলো কি পূর্বের ন্যায় পরিবর্তিত হবে না; সরকারকে তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ কি নানা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার লোভে আবারও সেই দুর্নীতির মাঝেই নিমজ্জিত হবে না, নিজেদের দলীয় স্বার্থে সংবিধান কি পুনরায় সংশোধন করা হবে না?

উপসিদ্ধান্ত -৪। এদেশের সকল অনিয়ম, অন্যায় ও দুর্নীতির সমস্যাটি জাতির মূল্যবোধের সাথে যুক্ত তাই নাগরিকদের মাঝে উচ্চ আত্মসম্মানবোধের মানসিক অভ্যাস মজবুত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে সব ধরণের অন্যায় হ্রাস করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকগণ আত্মসম্মানবোধের অনুশক্তিতে নিজেরা অন্যায় কর্ম করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি স্তরে অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য একতাবদ্ধ থাকবে।

উপসিদ্ধান্ত -৪ এর মূল আইডিয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, আত্মসম্মানবোধ মজবুত করার সিদ্ধান্তটি জননিরাপত্তার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে পারে তবে এই পদ্ধতি কোন তাৎক্ষণিক ফলাফল দিতে পারবে না কারণ সমাজে একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে যেহেতু দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংকট সমাধানের জন্য উপসিদ্ধান্ত ১,২ ও ৩ এর আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে দুর্নীতিপরায়ণ মানুসিকতার ফলে পারস্পারিক আস্থার সংকট রয়েছে তাই আস্থার চেতনা পুরুদ্ধার করা প্রয়োজন। আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন পারস্পারিক সহযোগিতার অভ্যাস, লোভ আর ভোগের বিচ্ছুরণ থেকে বিরত থাকার সামাজিক চেতনা, দায়িত্ববোধের অভ্যাস ও সহিষ্ণুতার মূল্যবোধ। এই সকল মূল্যবোধগুলো আত্মসম্মানবোধের সাথে যুক্ত করে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ করে গড়ে দেয়া হলে কাংক্ষিত ফলাফল পাওয়া সহজ হবে।

বস্তুত সঠিক মূল্যবোধের দ্বারা সৃষ্ট অনুশাসনের অনুশক্তি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেই শুধু নয় বরং বহুকাল ধরেই এ জাতির মাঝে বেশ দুর্বল বলেই ধারনা করা যায়। আত্মসম্মানবোধের চেতনা যথেষ্ট মজবুত না হওয়ায় নাগরিকদের মাঝে দুর্নীতির প্রতি ঘৃণাবোধ কমে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষেরা দুর্নীতি শব্দটিকেও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হচ্ছেন। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা, অন্যকে ঠকানো, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া, যেকোন ভাবেই হোক পদন্নোতি কিংবা ক্ষমতা পাওয়া নিশ্চিতভাবেই দুর্নীতি। কিন্তু রাস্তায় অনিয়ম করে গাড়ি চালানো, চাকুরী পাওয়ার জন্য সুপারিশ সংস্কৃতি, তীব্র শব্দে হর্ন বাজানো, জনকল্যাণে কিছু কাজ করে সেসব কাজের ছবি প্রচার করা, কাউকে অসম্মান করে কিছু বলা, প্রতিবেশির জন্য কষ্টকর হয় এমন আচরণ করা,

মানুষকে বিব্রত করা, এমনকি দামী পোশাক পরিধান করে মানুষকে দেখিয়ে বেড়ানো, দামী রেস্টুরেন্টে বসে খাবার খাওয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিয়ে অন্যদের অন্তরে অভাববোধ জাগিয়ে দেয়ার মত ক্ষতিকর আচরণগুলো যে দুর্নীতি পরায়ণ মানসিকতা থেকেই সৃষ্ট হয় তা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কার করে শ্রেষ্ঠ কোন পরিচালনা পদ্ধতির আয়োজন করা, অসাধারণ কোন আইন বা নিয়ম প্রবর্তন করা, নির্ভুল কোন সংবিধান লেখা, ঐ সব কোন কিছুই দীর্ঘমেয়াদে জনমানুষের অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। ৫ আগস্টের গন-অভ্যুত্থান থেকে স্পষ্ট হয়েছে একমাত্র যে শক্তি সরকারযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনমানুষের অধিকার সমুন্নত করতে পারবে তা হল জনগণের সম্মিলিত শক্তি। জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছেই কেবল অন্যসব শক্তি পদানত হতে পারে। বস্তুত,যতক্ষণ না দেশের মানুষ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য মজবুত ও শক্তিশালী হবে ততক্ষণ তারা অধিকার বঞ্চিতই থেকে যাবে। কিন্তু সাধারণ জনগণ কীভাবে অর্জন করবে সেই শক্তি যা দিয়ে তারা কোন ফ্যাসিবাদী সরকার ও সরকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল প্রকার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?

বস্তুত গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের জনগণের আচরণের সাথেই সেই শক্তি জড়িত। এদেশে ১৮ কোটি মানুষ এতদিন নির্যাতিত, শোষিত,ও নিষ্পেষিত হয়েছে অথচ তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিবাদ করতে পারেন নাই। হৃদয়ে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর ক্ষোভ জমা রেখেও তারা উপযুক্তভাবে প্রতিবাদ করার মানুষিক শক্তি অর্জন করতে পারেন নাই। চাকুরিজীবীগণ চাকুরি হারানোর ভয়ে প্রতিবাদ করেন নাই, গরীব মানুষেরা অসহায় অনুভব করে প্রতিবাদ করেন নাই আর চরিত্র হননের ভয়ে মুখ বন্ধ রেখেছিলেন সমাজের জ্ঞানীজনেরা। নিষ্পেষিতরা আরও বেশি নিষ্পেষিত হওয়ার ভয় থেকে প্রতিবাদ করেন নাই; যারা কিছুটা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিলেন তারা জনগণের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সাহায্য না পেয়ে দেশ ত্যাগ করে জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এই সাধারণ মানুষেরা এতদিন তেমন কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নাই কারণ তারা আত্মসম্মানবোধে দুর্বল এক ভীত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এতকাল। তবে এ জাতির সৌভাগ্য, অনেক দেরিতে হলেও নতুন যে প্রজন্ম দৃষ্টির আড়ালে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তারা সত্যিই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নির্ভীক এক প্রজন্ম। সাইদ, প্রিয়, আমীন ও মুগ্ধদের এই প্রজন্ম আধামরা প্রৌঢ়দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ কী জিনিস? বাংলাদেশের শিশু- কিশোর--যুবক শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত শক্তি ফেরাউনের শক্তিকে পরাভুত করেছে আর এরই দৃষ্টান্ত এখন দিকে দিকে পৃথিবীর বহু জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এদেশের সাধারণ মানুষ নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত থাকার সমস্যাটি তাদের মাঝে উপযুক্ত মাত্রার আত্মসম্মানবোধ না থাকার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। উপযুক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষ যেমন বস্ত্রহীন হয়ে রাস্তায় হেঁটে চলতে পারে না তেমনি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন

একজন মানুষ নিজেকে দুর্নীতির সাথে যুক্ত করতে কিংবা দুর্নীতি মেনে নিতেও পারে না। আত্মসম্মানবোধ একটি তীব্র অনুশাসন যা মানুষের আচরণকে অন্তরের গভীর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষই কেবল মূল্যবোধ নিয়ে জীবন যাপন করেন; তারা নিয়ম ও আইন মেনে চলেন এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হন। একজন আত্মসম্মানী পুলিশ অফিসার সচেতন থাকেন যে জনগণের ট্যাক্স থেকেই হবে তার দুপুরের খাবার; একজন আত্মসম্মানী সরকারী কর্মকর্তা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করাকে অত্যন্ত লজ্জাজনক আচরণ অনুভব করেন বলেই তা থেকে বিরত থাকেন; একজন আত্মসম্মানী নেতাই কেবল দলের কোন কনিষ্ঠ সদস্যের ভুলের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন এবং সেজন্য জনগনের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে পদত্যাগ করেন। আত্মসম্মানবোধ নিশ্চিতভাবেই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে এক শক্তিশালী অণুঘটক তবে একটি জাতি কীভাবে মজবুত আত্মসম্মানবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে কিংবা কেউ কেউ দুর্বল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হয় তা নিয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

মানব আচরণ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, প্রতিটি মানুষের মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই আত্মসম্মানবোধের বীজ বা অনুশক্তি বিদ্যমান। এই অনুশক্তির বীজটিকে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে চাষাবাদ বা লালন পালন করার মধ্য দিয়েই সমাজে আত্মসম্মানবোধের ভিত্তি মজবুত হয়। যেসব সমাজ জীবনে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, পরোপকার, সহানুভূতির প্রসার, প্রজ্ঞার চর্চা আর বিনয়ী ও সাধারণ জীবন যাপনকে সম্মানিত জীবনের সংজ্ঞা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সেই জাতির নাগরিকদের আত্মসম্মানবোধ পরস্পরের জন্য কল্যাণকর হতে দেখা যায়। এইরুপ মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্যবোধের অনুভূতি কম থাকে এবং পারস্পারিক আস্থা শক্তিশালী হয় তাই সেখানে সামাজিক সংহতি মজবুত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, কোন সামাজিক পরিবেশে যদি সঠিক আত্মসম্মানবোধের চর্চা উপেক্ষিত থাকে তবে সে জাতির মাঝে ক্ষতিকর মানসিক অভ্যাসের প্রচলন সৃষ্টি হয়। সঠিক পরিচর্যার অভাবে যেমন ফসলের জমিতে আগাছার বিস্তার ঘটে তেমনি সঠিক আত্মমর্যাদাবোধের চর্চা প্রতিষ্ঠিত না হলে সেখানে নানা প্রকার স্বার্থপর ও ক্ষতিকর আচরণের চর্চা বেড়ে যায়। দুর্নীতি এমনই একটি সামাজিক আগাছা যা সমাজের সকল স্তরের অভিভাবকগনের প্রজ্ঞার সংকটে হারিয়ে ফেলা আত্মসম্মানবোধের দুর্বলতা থেকেই জন্ম নেয়।

বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষকে বিবেচনা করা হয় এক একটি যন্ত্র হিসেবে, তবে সেটি অত্যন্ত উচ্চমানের ও উচ্চসক্ষমতার অতি স্মার্ট জৈবযন্ত্র। আচরণ বিজ্ঞান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষ তার মানসিক অভ্যাস দ্বারাই সব থেকে বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আত্মসম্মানবোধ যেমন একটি মানসিক অভ্যাস তেমনি দুর্নীতির মাঝে ডুবে থাকাও একটি মানসিক অভ্যাস। স্বার্থপরতা যেমন মানসিক অভ্যাস তেমনি বদান্যতাও মানসিক অভ্যাসের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সামাজিক পরিমণ্ডলে যা কিছুর গ্লোরিফিকেশন করা হয় অধিকাংশ মানুষের

আচরণ তেমটাই হতে দেখা যায়। বস্তুত, আজ যিনি অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ ও খারাপ মানুষ বলে সমাজে পরিচিত হয়েছেন তিনিও একদিন মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্পাপ শিশু হিসেবেই জন্ম নিয়েছিলেন। যে ব্যক্তিটি ন্যায় অন্যায় ভুলে ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ হত্যা করে জনগনের অধিকার হরণ করেছিলেন তিনিও শৈশবে হয়ত এমনটি ছিলেন না। মানব আচরণ বিজ্ঞান থেকে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকেই গঠিত হয়(বান্দুরা ২০০৯)। মানুষ তার চারপাশে যা কিছু ঘটতে দেখে সেসবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষা হিসেবে মস্তিস্কে গ্রহণ করে এবং বিশেষ করে যা কিছু আচরণকে মানুষ সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হতে দেখে তার প্রতিই অধিক আগ্রহী হয়। অন্যদিকে যা কিছু আচরণকে মানুষ নিজ নিজ পরিবেশে ঘৃণিত হতে দেখে সেসব আচরণ লজ্জাজনক বিবেচনা করে তারা ঐসব হতে বিরত থাকে। তাই একটি জাতির জাতিসত্ত্বা গঠনে সার্বজনীন কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিকট থেকে যেমন আচরণ আকাঙ্ক্ষা করা হয় সেইরুপ আচরণকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সম্মানিত আচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে দুর্নীতি বা খারাপ নীতি বা মন্দ আচরণ যা কিছু গণমানুষের শারীরিক, আত্মিক, সামাজিক ক্ষতির কারণ বলে বিবেচিত সেগুলোকে লজ্জাজনক বা ঘৃণিত আচরণ হিসেবে নির্দিষ্ট করে মানুষকে সচেতন করে তোলা দরকার। মন্দ আচরণকে জনজীবন থেকে মুছে ফেলার প্রয়োজনে শক্তিশালী সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাধারণ জনগণ সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষদেরই অনুকরণ করে তাই শক্তিশালী আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টিতে সমাজের শিক্ষিত ও ধনবান শ্রেণির মানুষের দায়িত্বই সর্বাধিক।

মানব আচরণ বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, সামাজিক পরিবেশই ভালো ও মন্দের চেতনা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে ভাল কিংবা মন্দ মানুষে পরিনত করে। একদল মানুস এবং বিশেষ করে সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরা যখন কোন কিছুকে ভালো, গৌরবময়, মর্যাদাপূর্ণ ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করতে থাকে তখন সেসবই হয়ে ওঠে সম্মানের মানদন্ড। তাই যে সমাজে প্রজ্ঞাবান মানুষকে সম্মান করা হয় সেখানে সাধারণ মানুষও প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠেন। আবার যেসব সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদকে সম্মানের মানদন্ড বানানো হয়েছে সেখানেই চলে দুর্নীতির চাষাবাদ। যেসব সমাজ ব্যবস্থায় শিশুশিক্ষায় আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় সেখানে নাগরিকগণ আত্মসম্মানী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন। এমন সব জাতি নৈতিক মূল্যবোধে অত্যন্ত শক্তিশালী হয় ফলে নাগরিকেরা নিজেরা যেমন অন্যায় থেকে বিরত থাকে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারাই শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। বস্তুত একজন আত্মসম্মানী মানুষই কেবল অন্যকে সম্মান করতে অভ্যস্ত থাকে; একজন আত্মসম্মানী মানুষকে অর্থের লোভ দেখিয়ে অন্যায় করানো সম্ভব হয় না। একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষ যেমন অন্যকে ঠকাতে লজ্জা অনুভব করেন তেমনি একদল আত্মসম্মানী মানুষ যখন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারাই কেবল আপন দায়িত্ববোধটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন রাঁধুনি নিজের কাজটিকে পরিস্কার পরিবেশে সম্পন্ন করেন; একজন আত্মসম্মানবোধে সচেতন চিকিৎসক তার রোগীকে

মনোযোগ দিয়ে দেখেন; একজন আত্মসম্মানী বিচারককে অর্থ কিংবা সুযোগ সুবিধার লোভ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। একজন উপযুক্ত মাত্রার আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সেনানায়ক কখনোই পদোন্নতির লোভে অন্যায় কাজে নিযুক্ত হয় না। একজন আত্মসম্মানী ব্যক্তি ঘুষ দিতে কিংবা ঘুষ গ্রহণ করতে পারেন না। একজন আত্মসম্মানী ড্রাইভারই কেবল রাস্তার নিয়ন মেনে চলে্ন; একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন যুবকই কেবল গুরুজনকে সম্মান করেন। বস্তুত উপযুক্ত আত্মসম্মানবোধ জাতীয় জীবনের ক্যানভাস হিসেবে কাজ করে যে ক্যানভাসে প্রতিফলিত হতে পারে রাষ্ট্রের সকল চিত্র। আত্মসম্মানবোধের মানসিক অভ্যাসই কেবল মানুষকে আপন অন্তরের গভীর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে চালিত রাখে যা জগতের কোন সংবিধান কিংবা আইন দিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে নাগরিকদের জন্য উপযুক্ত আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টির নিয়ামক কতটা রয়েছে এবং কীভাবে জাতির প্রত্যেক সদস্যের মাঝে উচ্চস্তরের আত্মমর্যাদাবোধ গঠন করা যাবে সে বিষয়ের গবেষণা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্তার চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক গণশিক্ষার বিসয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনোবিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করেছেন, মানুষ সারাদিনে যা কিছু দেখে তাই নিজেদের আচরণে গ্রহণ করে (বান্দুরা ২০০৯)। বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা চারপাশে প্রতিদিন যাকিছু পর্যবেক্ষণ করেছি সেখানে আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধির নিয়ামকের যথেষ্ট অভাব ছিল। সেখানে দুর্নীতিবাজদের সম্মান করা হয়েছে, জ্ঞানীজনদের অসম্মান করা হয়েছে, মদ-জুয়া-ক্যাসিনোর বিস্তার ঘটানো হয়েছে, নারী সমাজের সম্মান নষ্ট করতে তাদের অনেকের মাঝেই ভ্রান্ত গৌরববোধ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সবক্ষেত্রেই নানা পন্যের নানা বিজ্ঞাপনের বিস্তারে জনমানুষের অন্তরে স্বার্থপরতা ও অভাববোধকেই উস্কে দেয়া হয়েছে। কেউ উপজাতি, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেও মুক্তিযোদ্ধার নাতি, কেও রাজাকারের পুতি, কেও এলীট, কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ এই দল, কেউ ঐ দল, এভাবে নানা কৌশলে বিভেদ ও বৈষম্যের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ডিভাইড এন্ড রুল করার কৌশল চলেছে। প্রজ্ঞার সংকটে আক্রান্ত মিডিয়ার নির্মাতাগণ যেসব নাটক-সিনেমা তৈরি করেছেন সেখানে প্রায়ই অসম্মানজনক ও বৈষম্যমূলক আচরণকেই প্রোপাগেট করে গেছেন। এক সময় কবি, সাহিত্যিক,আর শিক্ষকগনের মাধ্যমেই জাতির দর্শন প্রতিষ্ঠিত হত কিন্তু এযুগে প্রতিটি মানুষের চেতনা যা দ্বারা প্রতিনিয়ত সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়ে চলেছে তা হল সোশ্যাল মিডিয়া। অথচ এইসব মিডিয়াতে যারা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কন্টেন্ট, ছবি,ইত্যাদি পোস্ট করে চলেছেন তারা অসচেতনেই এমন অনেক আচরণের বিস্তার করে চলেছেন যা মানুষের আত্মসম্মানবোধ নয় বরং লোভ আর ভোগকেই উস্কে দিচ্ছে। স্পষ্ট যে লোভ আর ভোগের বিচ্ছুরনের মাঝেই সংগোপনে লুকিয়ে থাকে বৈষম্যবোধ আর দুর্নীতির বিষাক্ত চারাগাছ।

৬.১.৩ সিদ্ধান্ত

সংস্কার যা কিছুই হোক আবারও সংবিধান বদলে যেতে পারে, জনবিরোধী আইন পুনরায় ফিরে আসতে পারে,রাস্ট্রযন্ত্রকেও সরকারের লেজুরবৃত্তিতে যুক্ত করা সম্ভব, নির্বাচন কমিশন কিংবা বিচারপতিগণও একদিন ব্যক্তি স্বার্থে কোন স্বৈরাচার সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে যেতে পারে। তাই পারস্পারিক মর্যাদার ভিত্তিতে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন আত্মসম্মানী জনগণই যেকোন সরকারের আচরণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং জনমানুষের স্বাধীনতা,অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

৬.২ পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্ত

৬.২.১ সার্ভে বা জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোচনা

একটি অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মজবুত জননিরাপত্তা (Human Security) অর্জনের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন কোনটি? প্রশ্নের উত্তরটি কিছুটা সহজ এবং মতামত প্রদানকারীকে জবাব প্রদানে উৎসাহিত করতে আমরা পাঁচটি সম্ভ্যাব্য উত্তরের যে কোন একটি বেছে নিতে অথবা অন্য কোন মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। নানা পেশা, বয়স ও শ্রেণির ৬৪২ জন এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন যার মাঝে ২৯৮ জন বা ৪৬% উত্তরদাতা মনে করেন যে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দায়িত্ববান নাগরিক দীর্ঘ মেয়াদী জননিরাপত্তা অর্জনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ২১৮ জন বা ৩৪% উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সক্ষমতার পক্ষে মত দিয়েছেন, ১২% উত্তরদাতা বলেছেন মজবুত অর্থ ব্যবস্থা ও বেকারত্ব দূরীকরণই মূল এখন মূল প্রয়োজন। ১১% উত্তরদাতা শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ৫% মতামত প্রদানকারী মনে করেন যে প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই এদেশে শক্তিশালী জননিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

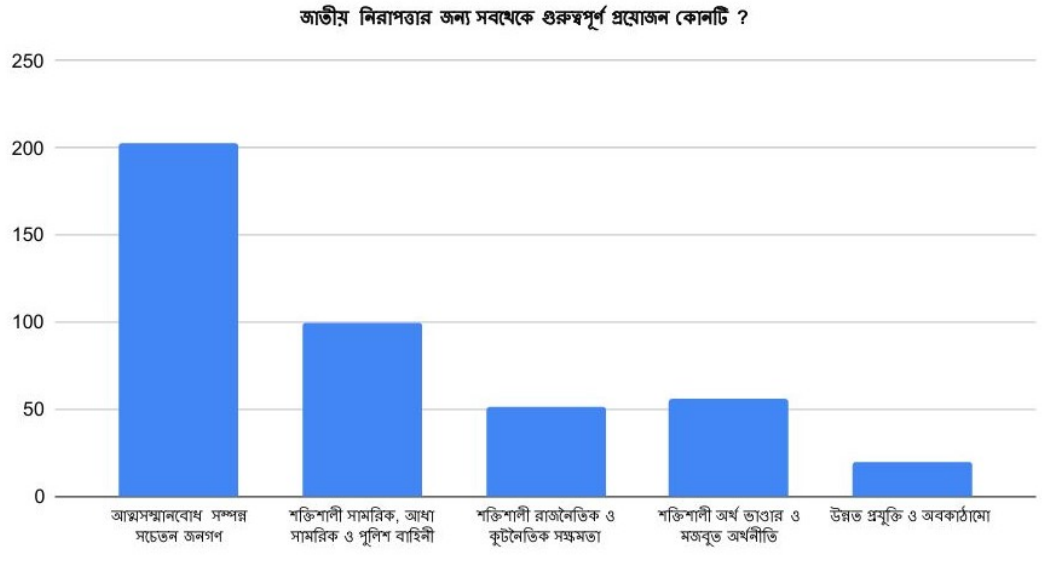

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে বিগত কয়েক দশক ধরে জনগণ যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল সে বিষয়ে অন্য একটি অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে একটি মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মতামত প্রদানকারিদের নিকট আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে, তাদের মতে বিগত কয়েক দশকের বিবেচনায় বাংলাদেশে কোন সমস্যাটি ১ নম্বর সমস্যা ছিল বলে তারা মনে করেন? এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটির উত্তর পেতে মতামত প্রদানকারীকে ছয়টি সম্ভাব্য উত্তরের যে কোন একটি বেছে নিতে অথবা অন্য কোন মতামত দেয়ার জন্য আনুরোধ করেছিলাম। নানা পেশা, বয়স ও শ্রেণির ৪৬৪ জন এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। ২৪২ জন বা ৫২% মতামত প্রদানকারী রাষ্ট্রীয় জীবনে লাগামহীন দুর্নীতিকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৪০ জন বা ৩০% মানুষ বলেছেন এদেশে কাংক্ষিত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দায়িত্ববান মানুষের অভাবেই অন্যসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত, ৫২% মতামত প্রদানকারিদের উপলব্ধি থেকে যদি দুর্নীতিকে এদেশের সব সমস্যার মূল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তবে একধাপ পেছনে নেমে এসে দেখা যায়, স্পষ্টতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল দুর্বল আত্মসম্মানবোধের কারনেই মানুষ দুর্নীতি প্রবণ হয়। তাই এই মতামত দুইটিকে একত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে ৮২% মতামত প্রদানকারীগণ আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দায়িত্ববান নাগরিক সৃষ্টির প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

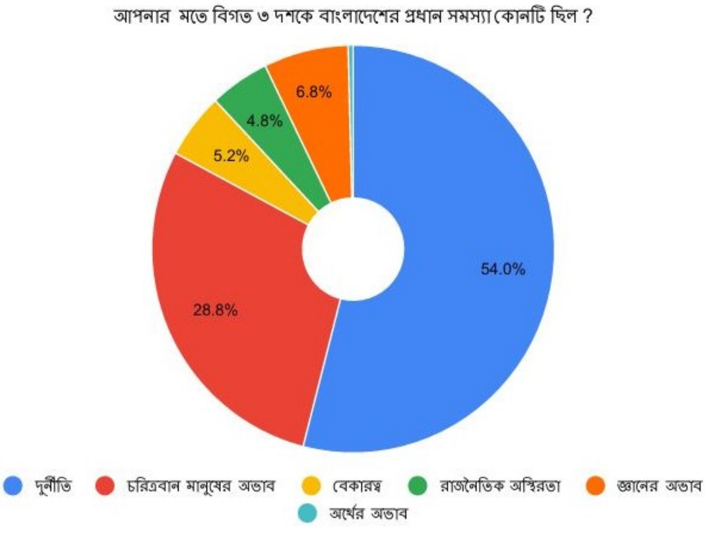

তৃতীয় একটি অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৯৯০ পরবর্তি তিন দশকে জনগণের মাঝে আত্মসম্মানবোধের অনুভূতি কেমন মাত্রার ছিল তা জানতে চেয়ে লিকারট স্কেলে পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তরের যে কোন একটি বেছে নিতে অথবা অন্য কোন মতামত দেয়ার জন্য আনুরোধ করেছিলাম। নানা পেশা, বয়স ও শ্রেণির ৬৪১ জন এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন যার মধ্যে ৩৫৮ জন বা ৫৬% মনে করেন এদেশের নাগরিকদের মাঝে আত্মসম্মানবোধের অনুভূতি অত্যন্ত নিম্নমাত্রায় ছিল। ২৪১ জন বা ৩৭% মত দিয়েছেন যে বিগত ৩ দশকে এদেশের মানুষের মাঝে আত্মসম্মানবোধের অনুভূতি প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। স্পষ্টতই ৯৩% উত্তর দাতা উপলব্ধি করেছেন যে এদেশে বিগত ৩ দশকে জনগনের আত্মসম্মানবোধের সুচক প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং অত্যন্ত কম অনুভূত হয়ছে।

৬.২.২ ইন্টারভিও এবং গ্রুপ আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্যের আলোচনা

বাংলাদেশের জননিরাপত্তা বিষয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক কোনটি? এদেশের কোন সমস্যাটিকে বলা যেতে পারে অন্য সব সংকটের মূল শেকড়? আত্মমর্যাদার উন্নয়ন কীভাবে এদেশের শান্তি, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে? এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা ৮টি গ্রুপ আলোচনা (FGD) এবং ৩২টি ইন্টারভিও আয়োজন করেছিলাম। গ্রুপ আলোচনায় প্রতিটি দলে ৭ থেকে ১০ জনকে তাদের বয়স ও পেশা ভিত্তিতে নির্বাচন করে তাদের মতামত নিয়েছিলাম। আলাদা আলাদা সেই গ্রুপগুলোতে ছিলেন শিক্ষকগন, ব্যবসায়ী, মহিলা, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, শিক্ষার্থী,সামরিক বাহিনীর সদস্য, পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও সাংবাদিক।

এছারাও উপরোক্ত তিনটি প্রশ্ন নিয়ে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞগনের ইন্টারভিও থেকে আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে সার্বজনীন কল্যাণের পথে সচল রাখা এবং জাতীয় জীবনে বৈষম্যহীন নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। শিশুদের জন্য তাদের পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত সচেতনায় গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিকুলামে টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর বিপরীতে শিশু কিশোরদের অন্তরে আত্মসম্মানবোধের ভিত্তি ও দায়িত্বশীল মানুষ করে গড়ে তোলার বিষয়টিতে বিশেষজ্ঞগণ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে রাষ্ট্রের সকল স্তরের মিডিয়া ব্যক্তিবর্গকে এমনভাবে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা দরকার যেন তাদের মূল লক্ষ্যটি হয় গণমানুষের মাঝে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এজেন্ডা বাস্তবায়ন। তারা মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রেই সত্য প্রকাশের নামে কিংবা নির্মল বিনোদন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিডিয়া কর্মীগনের অনেকেই গণচেতনার জন্য ক্ষতিকর এমন সব বিষয়গুলো সর্বসম্মুখে তুলে ধরেন যা অন্যায়। বিশেষজ্ঞগনের মতে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায়, বাড়িতে বাড়িতে গণশিক্ষার কর্মী ও জনপ্রতিনিধি নিয়োগ করে যারা নতুন পিতামাতা হয়েছেন তাদেরকে সচেতন করা এবং সমাজের সর্বস্তরে আত্মসম্মান বৃদ্ধির উপরে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল, ১৯৮০ এর দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পকে যেভাবে বাস্তাবায়ন করা হয়েছিল সে আদলেই দুর্নীতিকে সমাজে সর্বোচ্চ লজ্জাজনক আচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাদের মতে, দুর্নীতিকে মানুষের চেতনা ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাই এই ভাইরাসকে নিশ্চিহ্ন করতে আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেটুকু ভুমিকা রাখতে পারে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাৎক্ষণিক ফলাফল পেতে এবং জনজীবনকে স্বাভাবিক রাখতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ জরুরী তবে দীর্ঘমেয়াদে দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে এই জাতির চেতনার পরিবর্তন দরকার। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, দুর্নীতিকে শুধু অবৈধ উপায়ে অর্থ কিংবা অন্যায্য সুবিধা অর্জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ করার চিন্তা থেকে বের হতে হবে। তারা বলেছেন, দুর্নীতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপরমূলক আচরণের

অভ্যাস থেকেই ধীরে ধীরে বড় বড় অন্যায়ের জন্ম দেয়। একারনেই, জনজীবনের জন্য অকল্যান হতে পারে এমন সব আচরণ তা যত ছোটই হোক না কেন সেসব আচরণকে অংকুরেই থামিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে। এই সচেতনতা পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায় থেকে সৃষ্টি হওয়া দরকার। তাদের মতে, সমাজের মানুষ যখন সচেতন হবেন, দায়িত্ববোধের অনুশীলনে অভ্যস্ত হবেন, দায়িত্ববোধ যখন আত্মসম্মানের নিয়ামক হিসেবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল তখনই অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে জাতি স্থায়ীভাবে রক্ষা পেতে পারে। অন্যথায় যে পুলিশ দুর্নীতি করে তাকে ধরার জন্য কে আছে? যে বিচারক অনিয়ম করে তাকে আটকাবে কে? দেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী যদি দুর্নীতির সাথে যুক্ত হন তবে সে দুর্নীতি রুখতে পারবে কে? যিনি বা যারা দুর্নীতি রুখতে কাজ করবেন তারাও কি দুর্নীতিতে যুক্ত হতে পারেন না?

৬.২.৩সিদ্ধান্ত

প্রতিটি মানুষের অন্তরে উপযুক্ত আত্মসম্মানবোধের অনুভূতি মজবুত হলে দীর্ঘমেয়াদে এদেশ থেকে দুর্নীতি, বৈষম্য আর অনিয়মকে রুখে দেয়া যাবে। একটি ছোট্ট ছিদ্র থেকে যেমন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা সৃষ্টি করে ভাসিয়ে নেয় সবকিছু, তেমনি একটি ছোট্ট দুর্নীতির সুযোগ থেকেই বড় বড় দুর্নীতির জন্ম হয়। সাধারণ মানুষ চারপাশের পরিবেশে যা কিছুর বিচ্ছুরণ দেখে তার প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে। যেসব মানুষকে তাদের সামনে সম্মানিত হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তাদেরকেই জনগণ অনুসরণ করে তাই, তাই রাষ্ট্র ও সমাজের অভিভাবকগণকে ব্যক্তিগত জীবন যাপনে এমন দায়িত্ববোধের উদাহরণ জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করা উচিত যেন সাধারণ মানুষ দায়িত্ববোধকেই তাদের জীবনে আত্মসম্মান অনুভব করতে অভ্যস্ত হন। একজন পিতাকে দায়িত্ববোধের আত্মসম্মান নিয়ে সন্তানের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করেতে হবে, একজন ব্যবসায়িকে দায়িত্ববোধের আত্মসম্মান নিয়ে ক্রেতাদের কল্যাণে কাজ করার অভ্যাস করতে হবে, একজন শ্রমিক তার কাজটুকু আন্তরিকভাবে করবেন আপন দায়িত্ববোধের অনুভূতি থেকে। ব্যক্তিগত আচরণে সকলকেই সচেতন থাকা দরকার যেন অন্য কারো মাঝে বৈষম্যের অনুভূতি সৃষ্টি হতে না পারে। সম্মান ও মর্যাদাকে বাহ্যিক চাকচিক্যের বদলে প্রজ্ঞার চাকচিক্যের পথে নেওয়া জরুরী। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এদেশের বিত্তবান ও ধনী শ্রেণিকে নিজেদের দৈনিন্দন জীবন যাপনে বিলাসী না হয়ে বরং সংযত আচরণে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন যেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগণ নিজেদেরকে বৈষম্যের শিকার অনুভব না করেন।

৭.১অভিমত

১। উপযুক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে বাঙ্গালি জাতির সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রাত্যহিক জীবন যাপন পর্যালোচনা করে মানব আচরণ বিজ্ঞানের মানদণ্ডে একটি মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে

দৈনিন্দন জনজীবনে কোন কোন আচরণ সম্মানজনক এবং কোন কোন আচরণ লজ্জাজনক তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২। প্রাতিষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নাগরিকদের মাঝে জাতির চরিত্র মজবুত করতে কাঙ্ক্ষিত আত্মসম্মানবোধের চেতনা মজবুত করার বাস্তবধর্মী কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের হাতেই শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সৃষ্টি হতে পারে তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা প্রয়োজন যেন জাতির মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষকতাকে তাদের জীবন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহন করতে পারে।

৮.১উপসংহার

আত্মমর্যাদাবোধকে বলা যেতে পারে জাতীয় জীবনের ক্যানভাস। যার আত্মমর্যাদাবোধ যত শক্তিশালী তিনিই হন তত বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, দায়িত্ববান ও বিবেচক মানুষ। আত্মসম্মানী মানুষ হন প্রজ্ঞাবান, সহনশীল, নির্লোভ মমতাময়ী ও সচেতন। তবে, আত্মসম্মানবোধের মাঝেও ভ্রান্তবোধ থাকা স্বাভাবিক, তাই কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে মনোবিজ্ঞান ও আচরণ বিজ্ঞানের আলোকে উপযুক্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে এ জাতির জন্য সবথেকে মানানসই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার।আত্মসম্মানবোধ মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির সাথে সাথে আত্মিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার তীব্র অণুশক্তি হলেও তা মূলত পরিবেশ দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক জীবনের মানসিক অভ্যাস। আত্মসম্মানবোধকে সামাজিক অভ্যাসেরই প্রতিফলন, তাই মানুষ তাদের শিশুকাল থেকে চারপাশের পরিবেশ হতে যা কিছু সম্মানজনক বলে জানতে শিখে সেইসবই তাদের মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে। অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় মানুষের জীবন তাই আত্মসম্মানবোধের অভ্যাস উচ্চমানের কিংবা নিম্নমানের দুইই হতে পারে। নিম্নস্তরের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদার ভ্রান্ত অভ্যাসই স্বৈরাচারী হৃদয়ের মনোকাঠামো এবং তারাই সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচারের পথে অন্যতম মূল বাধা হিসেবে ক্রিয়া করে। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অগ্রগতি, শান্তি ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে তাই প্রতিটি মানুষকে প্রজ্ঞাপূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধের অভ্যাসে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন যেন সেখানে মানুষের আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সমাপনান্তে ডিগ্রি প্রদানের পূর্বেও এ বিষয়ের মূল্যায়ন জরুরী কারণ জাতির উন্নয়নের জন্য বিদ্বান জনগোষ্ঠীর যেমন দরকার ততোধিক প্রয়োজন আত্মসম্মানী দায়িত্ববান মানুষ। তাই জাতি গঠনের জন্য সামাজিক আন্দোলনের স্লোগান হতে পারেঃ

"সার্বিক আত্মসম্মানবোধই সার্বিক নিরাপত্তা
মজবুত আত্মমর্যাদাবোধই মজবুত অধিকারের নিশ্চয়তা
ক্ষমতা নয় দায়িত্বই নেত্রিত্বের যোগ্যতা
স্বচ্ছতাই সম্মান
প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতা"

প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা যেন হয় আত্মসম্মানী মানুষের আবাসন; প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যেন হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চমানের আত্মমর্যাদার অভ্যাস সৃষ্টি; প্রতিটি গল্প, কবিতা,নাটক,ছবি, ভিডিওচিত্র,

বিতর্ক,শো-টক , কিংবা বিনোদন ও উপভোগের আয়োজনও যেন হয় আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার প্রচার, সে প্রত্যাশাই রইলো।

References:

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Harvard University Press.

Clarke, R. A., & Knake, R. K. (2019). The Fifth Domain: Defending Our Country, Our Companies, and Ourselves in the Age of Cyber Threats. Penguin Press.

CNA Corporation. (2007). National Security and the Threat of Climate Change. CNA Corporation.

Cordesman, A. H. (2017). Rethinking the Future: U.S. Defense and Aerospace in the 21st Century. Center for Strategic and International Studies.

Flynn, S. E. (2007). The Edge of Disaster: Rebuilding a Resilient Nation. Random House.

Gostin, L. O. (2020). Global Health Security: A Blueprint for the Future. Harvard University Press.

Haass, R. (2020). The World: A Brief Introduction. Penguin Press.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Rotberg, R. I. (2014). Good Governance and National Security. Brookings Institution Press.

Yergin, D. (2020). The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations. Penguin Press.

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report.*

 United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security.*

 United Nations Development Programme (UNDP). (2009). *Governance for Sustainable Human Development.*

 United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone.*

 United Nations. (2012). *The UN and Post-Conflict Peacebuilding.*